সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৫

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও প্রবীণ সম্মাননা

শিশুর বুদ্ধিমত্তার বিকাশে করণীয়

প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও রিসাইক্লিং বিষয়ে সংলাপ

গত ১২ই মার্চ ২০২৫এ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) এবং বাংলাদেশ পেট্রোকেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড (বিপিসিএল) যৌথভাবে প্লাস্টিক ফ্রি রিভার্স এন্ড সিজ ফর সাউথ এশিয়া (প্লিজ) প্রকল্প বিষয়ে স্টেকহোল্ডার ডায়ালগ আয়োজন করে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। এছাড়া উক্ত মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশ বিষয়ক প্রতিনিধি, ইউএনওপিএস-এর কর্মকর্তাগণ, কমার্শিয়াল কোম্পানিসমূহের মুখ্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রিসাইকেলিং বিজনেস ইউনিটের (আরবিইউ) কাঠামো ও কার্যক্রমের গতিশীলতা তুলে ধরাই ছিলো অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন

শিক্ষালোক

ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

ফেব্রুয়ারি - মার্চ ২০২৫ ● ১২তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

সূচি

শিশুর বুদ্ধিমত্তার বিকাশে করণীয়
- আলাউল হোসেন ২

নতুন ফসল আবাদ
- প্রতাপ চন্দ্র রায় ও ফজলুল বারি ৪

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে পুরস্কার বিতরণ ৪

ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় - সোহেল রানা ভূঁইয়া ১৩

জলপাই - তানভীর আহম্মেদ ১৫

নিবেদিত-প্রাণ একটি সংগঠনের কথা
- কাকলী খাতুন ১৬

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও প্রবীণ সম্মাননা
- মো. জাহিদুল ইসলাম ১৮

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও প্রবীণ সম্মাননা-২০২৫
- প্রতাপ চন্দ্র রায় ২০

নারী দিবস ২১

মুক্তপাঠাগার আয়োজিত বইয়ের মেলা ২২

সমাজকর্ম বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা ২৩

আফুজার সাফল্য - মো. আব্দুল মান্নান সরদার ২৪

সিমু খাতুনের সফলতার গল্প - মো. জাহিদ হাসান ২৬

কবি হেলাল হাফিজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি ২৮

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি irc.com.bd

সম্পাদকীয়

বছরের শেষে বা শুরুতে গ্রামে গ্রামে শিশুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। কোভিড-১৯-এর পর অবশ্য কয়েক বছর এই আয়োজন করা সম্ভব হয়নি সংগত কারণেই। এবার ১২ থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত এই সুন্দর আয়োজনটি আবার হয়েছে। এই এক সপ্তাহ জুড়ে আমাদের সব কর্ম-এলাকায় একটা উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে থাকে। এ সময় সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে সকল কর্মী গ্রামে গ্রামে চলে যান এবং এই মনজুড়ানো আয়োজনে অংশ নেন। আমাদের উঠানস্কুলের সকল শিশু তাদের গান, নাচ, আবৃত্তি, যেমন খুশি তেমন সাজো, খেলাধুলা, কৌতুক ইত্যাদির সমাহার নিয়ে শীতের বিকেলকে প্রাণময় করে তোলে। কেবল তাই নয়, সেখানে শিশুরা এলাকার প্রবীণ-প্রবীণাদের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে সমাজে ও পরিবারে প্রবীণ-প্রবীণাকে যথাযথ সম্মান প্রদানের প্রতিজ্ঞা করেন। এবার শিক্ষালোকের প্রচ্ছদে ও দুটি লেখায় তাই প্রতিফলিত।

শিশুর সৃজনশীলতা ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সহায়তাও সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি এবং এ বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি লক্ষ্য। গ্রামীণ শিশুদের এই মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানগুলি সত্যিই উপভোগ করার মত। কোনো কোনো শিশুর প্রতিভা দেখলে সত্যিই মনে হয় উপযুক্ত পরিবেশ ও নির্দেশনা পেলে এরা একদিন অনেক বড় হয়ে উঠতে পারে।

আলাউল হোসেনের এ বিষয়ক স্বল্পপরিসরের লেখাটিকেই এবার প্রধান রচনা করা হলো বিষয়ের গুরুত্বের কারণে। আমাদের পরিবারে, সমাজে ও শিক্ষাব্যবস্থায় বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরভাবে ভাববার অবকাশ রয়েছে।

গত সংখ্যা থেকে প্রকাশিত ধারাবাহিক নিবন্ধ 'নতুন ফসল আবাদ'-এ দু'জন কৃষকের গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ নিয়ে গবেষণাধর্মী লেখাটির ২য় পর্ব এবার ছাপা হলো। অফুজা বেগম ও সিমু খাতুনের সাফল্যের কথা আপনাদের ভাল লাগবে আশা করি। দেশের অতি পুরাতন স্কুল নিয়ে স্মৃতিকথা আমরা আগেও ছাপিয়েছি। এবারও ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের কথা ছাপানো হলো।

এগুলোসহ অন্যান্য আয়োজন নিয়ে বৈচিত্র্যময় এবারের সংখ্যাটিও আশা করি সবার ভাল লাগবে।

ফজলুল বারি

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস
বাড়ী নং- ২২/৯, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

শিশুর বুদ্ধিমত্তার বিকাশে করণীয়

আলাউল হোসেন

শিশু মানেই সম্ভাবনার অপার দুয়ার। প্রতিটি শিশুর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে এক অনন্য প্রতিভা, যা সময় ও সুযোগ পেলে ফুটে ওঠে। কিন্তু আমাদের সমাজে এখনো একটি প্রচলিত ধারণা রয়ে গেছে– শুধুমাত্র ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বিসিএস ক্যাডার হলেই যেন জীবনে সফল হওয়া যায়। এই সংকীর্ণ চিন্তার কারণে অধিকাংশ অভিভাবক তাদের সন্তানের প্রকৃত মেধা ও সম্ভাবনাকে বুঝতে ব্যর্থ হন। তারা সন্তানের স্বপ্ন ও আগ্রহকে উপেক্ষা করে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বাধ্যতামূলকভাবে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে অনেক শিশু একসময় হতাশায় ডুবে যায়, শিক্ষা ও জীবনের প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। অথচ, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার না হয়েও জীবনে সফল হওয়ার হাজারো পথ আছে, যা অভিভাবকদের উপলব্ধি করা জরুরি।

শিশুর মেধা ও এর বৈচিত্র্য

প্রত্যেক মানুষের মেধা এক রকম নয়। কারও মেধা বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা-ভাবনায়, কারও শিল্প-সংস্কৃতিতে, কেউবা প্রযুক্তিতে পারদর্শী। এ ক্ষেত্রে শিশুর মেধাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন-

১. একাডেমিক মেধা: যারা মূলত পড়াশোনায় পারদর্শী এবং বিজ্ঞান, গণিত, ভাষা ও সাহিত্য ভালো বোঝে।

২. সৃজনশীল মেধা: যারা গান, নাচ, ছবি আঁকা, সাহিত্য রচনা বা অভিনয়ে পারদর্শী।

৩. প্রযুক্তিগত মেধা: যারা কম্পিউটার, প্রোগ্রামিং, ইলেকট্রনিক্স বা প্রযুক্তি-সম্পর্কিত কাজে আগ্রহী।

৪. খেলাধুলার মেধা: যারা শারীরিক কৌশল, দৌড়, ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার বা অন্যান্য ক্রীড়া ক্ষেত্রে দক্ষ।

৫. ব্যবসায়িক বা উদ্ভাবনী মেধা: যারা নতুন নতুন চিন্তা করতে পারে, নেতৃত্ব দিতে পারে এবং উদ্যোগী হতে পারে।

৬. সামাজিক ও মানবিক মেধা: যারা মানুষের সাথে ভালোভাবে মিশতে পারে, নেতৃত্ব দিতে পারে এবং সমাজের কল্যাণে কাজ করতে চায়।

এই ভিন্নতাগুলো বুঝতে না পারার কারণে অনেক শিশু নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় না। ফলে তারা জীবনে হতাশায় নিমজ্জিত হয় এবং প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

অভিভাবকদের প্রচলিত ভুল ও তার প্রভাব

আমাদের সমাজে অধিকাংশ অভিভাবক মনে করেন, যদি তাদের সন্তান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা হতে না পারে, তবে সে জীবনযুদ্ধে পরাজিত হবে। এই ধারণা থেকে তারা সন্তানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন, যা শিশুর স্বাভাবিক মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এ ধরনের মানসিক চাপের ফলে

- শিশুর আত্মবিশ্বাস কমে যায়;
- পড়াশোনার প্রতি ভয় বা বিরক্তি জন্ম নেয়;
- সৃজনশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়; এবং
- হতাশা ও মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করে।

অনেক শিশু ব্যর্থতার ভয়ে চরম সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলে, যা আমাদের সমাজে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে।

কীভাবে শিশুর মেধার মৌলিক দিক খুঁজে বের করবেন?

সন্তানের মেধা আবিষ্কার করা এবং তা বিকাশে সহায়তা করা অভিভাবকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এর জন্য কিছু ধাপে কাজ করা যেতে পারে। যেমন-

সন্তানের আগ্রহ পর্যবেক্ষণ করুন: কোন বিষয়ে সে আনন্দ পায়, কোন কাজ করতে গেলে সময়ের খেয়াল থাকে না, সেই বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখুন।

সৃজনশীল কাজে উৎসাহ দিন: ছবি আঁকা, গান গাওয়া, যন্ত্র বাজানো, অভিনয়, প্রোগ্রামিং, গল্প লেখা ইত্যাদির প্রতি সন্তানের আগ্রহ থাকলে তাকে প্রয়োজনীয় সুযোগ দিন।

স্বাধীনভাবে ভাবতে শেখান: শিশুর ওপর নিজের পছন্দ চাপিয়ে না দিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিন।

প্রশংসা করুন ও আত্মবিশ্বাস বাড়ান: প্রতিটি ছোট ছোট অর্জনকেও গুরুত্ব দিন এবং তাকে উৎসাহিত করুন।

সঠিক দিক নির্দেশনা দিন: যদি সে খেলাধুলায় ভালো হয়, তাহলে ভালো প্রশিক্ষক খুঁজে দিন। যদি সে প্রযুক্তিতে দক্ষ হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিন।

সফলতার সংজ্ঞা নতুনভাবে নির্ধারণ করা জরুরি

সফলতা মানে শুধু বড় চাকরি বা অর্থবিত্ত নয়, বরং সফলতা মানে আত্মতৃপ্তি, আনন্দ ও নিজের প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ। আজকের বিশ্বে এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে দক্ষতা অর্জন করে কেউ একজন প্রচুর সম্মান, অর্থ ও স্বীকৃতি অর্জন করতে পারে

- একজন শিল্পী বা ডিজাইনার আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করতে পারেন;
- একজন ভালো উদ্যোক্তা হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন;
- একজন ক্রীড়াবিদ দেশকে গৌরব এনে দিতে পারেন;
- একজন প্রযুক্তিবিদ বা প্রোগ্রামার বৈশ্বিকভাবে নিজের দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন;
- একজন ইউটিউবার বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কোটি কোটি মানুষের কাছে নিজেকে মেলে ধরতে পারেন।

প্রতিটি শিশুই এক একটি সম্ভাবনার বীজ। এই বীজকে ঠিকমতো পরিচর্যা করতে পারলে তা একদিন মহীরুহে পরিণত হবে। অভিভাবকদের উচিত নিজেদের সংকীর্ণ চিন্তার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সন্তানের আগ্রহ ও প্রতিভাকে মূল্যায়ন করা

তাই অভিভাবকদের উচিত, সন্তানদের প্রতিভা অনুযায়ী তাদের পথ তৈরি করে দেওয়া, যাতে তারা তাদের পছন্দের ক্ষেত্রে সফল হতে পারে।

অভিভাবকদের মনে রাখতে হবে– প্রতিটি শিশুই এক একটি সম্ভাবনার বীজ। এই বীজকে ঠিকমতো পরিচর্যা করতে পারলে তা একদিন মহিরুহে পরিণত হবে। অভিভাবকদের উচিত নিজেদের সংকীর্ণ চিন্তার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সন্তানের আগ্রহ ও প্রতিভাকে মূল্যায়ন করা। কারণ, যে শিশু তার ভালোবাসার কাজে নিজেকে নিমজ্জিত করতে পারে, সে-ই প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারে।

তাই আসুন, আমরা আমাদের সন্তানকে তাদের স্বপ্নের পথে হাঁটতে দিই। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও পৃথিবীতে সফল হওয়ার অগণিত সুযোগ আছে শুধু দরকার সঠিক দিকনির্দেশনা ও সমর্থন। একদিন এ শিশুরাই হবে আগামি দিনের আলোকবর্তিকা, যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল হয়ে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে তুলবে।

লেখক: শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক

কেইস স্টাডি

নতুন ফসল আবাদ

সিদীপের দুই জন কৃষকের একটি করে প্লটে দুই বছরে বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ পদ্ধতি, উৎপাদন ও আয়-ব্যয়

প্রতাপ চন্দ্র রায় ও ফজলুল বারি

সিদীপের দু'জন কৃষকের আবাদকৃত নতুন ফসল গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের বৃত্তান্ত জানতে গিয়ে টানা ২৭ মাস ধরে তাদের প্লট দুটিতে যে সকল ফসল একের পর এক চাষ করা হয়েছিল তাদের চাষাবাদ বৃত্তান্তের সকল তথ্যাদি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয়েছে গত এপ্রিল ২০২২ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত। এতে দুটি বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এক, জমির ব্যবহার অর্থাৎ এই ২৭ মাসে কোন কৃষক কি কি ফসল একের পর এক চাষ করেছেন। এতে জমিতে কোন ফসল কতদিন ছিল এবং ফসলের ফাঁকে জমি মোট কতদিন পতিত ছিল– এ নিয়ে দু'জন কৃষকের জমি ব্যবহারের একটি তুলনামুলক চিত্র ফুটে উঠেছে। দুই, প্লট দুটিতে চাষকৃত প্রত্যেকটি ফসলের চাষপদ্ধতি, উৎপাদনের হার এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়েছে। স্বভাবতই এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিবন্ধটির কলেবর অনেক বড় হয়ে গেছে। তাই এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১ম পর্বটি অক্টোবর '২৪-জানুয়ারী '২৫ 'শিক্ষালোক' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে নিবন্ধটি রচনার প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশে গ্রীষ্ম মৌসুমে টমেটো চাষের প্রতিকুলতা কাটিয়ে উঠে এ দেশের বিজ্ঞানীদের দ্বারা উদ্ভাবিত উপযোগী জাত সৃষ্টি ও অবমুক্তকরণ প্রক্রিয়া, দু'জন কৃষকের কাছ থেকে ক্রমাগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, দু'বছর ব্যাপী জমি ব্যবহার তথা ফসলের সময়কাল ও পতিত সময় নিয়ে চিত্র ও তালিকার মাধ্যমে একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা, কৃষকদের পারিবারিক পরিচিতি, জমির মালিকানা ও তাদের পেশা, গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে জমির পরমাণ ও গ্রীষ্মকালীন টমেটোর জাত ও চারা নির্বাচন, সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় দ্বিতীয় পর্বে জমি প্রস্তুতি থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত চাষ পদ্ধতি, উৎপাদন ও আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হল।

জমি প্রস্তুতি: ২০২২ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে মনির হোসেন ও মো. কামরুল তাদের জমি প্রস্তুতির কাজ শুরু করেন। জমি প্রস্তুতির সময় মনির হোসেন ও মো. কামরুল ট্রাক্টরের মাধ্যমে সর্বমোট তিনটি চাষ দেন। চাষ বাবদ মনির হোসেনের সর্বমোট ১২,০০০ টাকা ও মো. কামরুলের ১০,৭০০ টাকা ব্যয় হয়েছে। চাষ পরবর্তীতে মনির হোসেন ও মো. কামরুল যে সমস্ত সার ব্যবহার করেছেন তার নাম ও মূল্যমান নিম্নরূপ

মনির হোসেনের ক্ষেত্রে

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	মূল্য (কেজি প্রতি)	মোট মূল্য
কম্পোস্ট	৭০০	১২	৮৪০০
কম্পোস্ট	৮০	৪০	৩২০০
পটাশ	১৭	৪০	৬৮০
		সর্বমোট খরচ	১২,২৮০

মো. কামরুলের ক্ষেত্রে

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	মূল্য (কেজি প্রতি)	মোট মূল্য
কম্পোস্ট	৬৮০	১২.৫০	৮৫০০
কম্পোস্ট	৬৮	৪২	২৮৫৬
পটাশ	১৫	৪২	৬৩০
		সর্বমোট খরচ	১১,৯৮৬

চারা সংগ্রহ: বারি হাইব্রিড-০৮ ও তিত বেগুনের গ্রাফটিং করা চারা মনির হোসেন সিলেটের হবিগঞ্জ থেকে সংগ্রহ করেছেন। মনির হোসেন মোট আট হাজার (৮০০০) চারা সংগ্রহ করেছেন যার মূল্য ৬৪,০০০ টাকা। চারা নিয়ে আসার জন্য পরিবহন খরচ হয়েছে ১৫,০০০ টাকা। অন্যদিকে মো. কামরুল বারি হাইব্রিড-০৮ জাতের চারা ব্রাক্ষণবাড়িয়ার গ্রীণ নার্সারী থেকে সংগ্রহ করেছেন। তিনি মোট সাত হাজার ছয়শত (৭,৬০০) চারা সংগ্রহ করেছেন যার মূল্য ছিল ৫৭,০০০ টাকা। চারা নিয়ে আসার জন্য খরচ হয়েছে ৪,৫০০

টমেটো গাছ দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য মুলির ব্যবহার

টাকা। মনির হোসেন ০২-০৫-২০২২ তারিখে তার জমিতে চারা রোপণ শুরু করেন এবং মো: কামরুল ০৮-০৫-২০২২ তারিখে চারা রোপণের কাজ শুরু করেন। মনির হোসেনের চারা রোপণের জন্য ১৬ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছে যার দৈনিক পারিশ্রমিক ছিল প্রতি জন ৬০০ টাকা করে এবং মো. কামরুলের চারা রোপণের জন্য ১৮ জন শ্রমিক নিয়েছিলেন, তবে এর মধ্যে ১২ জন ছিল পুরুষ শ্রমিক ও বাকি ৬ জন ছিল নারী শ্রমিক। এখানে পুরুষ শ্রমিকের দৈনিক শ্রমমূল্য ৫০০ টাকা ও নারী শ্রমিকের দৈনিক শ্রমমূল্য ৩৫০ টাকা।

আন্তঃফসল পরিচর্যা

মাচা তৈরি: মনির হোসেন গ্রীষ্মকালীন টমেটো রোপণের জন্য কোন মাচা ব্যবহার করেননি। তিনি এখানে মালচিং পেপার ব্যবহার করেছেন। মালচিং পেপার বাবদ তিনি ২৩,০০০ টাকা খরচ করেছেন। টমেটোর চারা সোজাভাবে দাঁড় করানোর জন্য ছোট বাঁশের খুটি ব্যবহার করেছেন যা স্থানীয় ভাষায় মুলি বলা হয়। এ জন্য প্রয়োজন হয়েছে মুলি, সুতা ও জাল। মুলি ক্রয়ের জন্য তার ৩২০০০, সুতা ২০০০ ও জাল ক্রয়ে ১৪০০০ টাকা খরচ হয়েছে। টমেটো চারার সাথে মুলি বাঁধার জন্য তিনি মোট ১২ জন শ্রমিক নিয়েছেন যার দৈনিক শ্রমমূল্য ছিল ৬০০ টাকা এবং সময় লেগেছে ২ দিন।

জমিতে চারা রোপণ কার্যক্রম

অন্যদিকে মো. কামরুল তার জমিতে মাচা ব্যবহার করেছেন এবং তারা জমিটুকু পলিইথিলিন নামক পলিথিন দ্বারা পুরোপুরি আবৃত করে ফেলেন। তবে তিনি যেহেতু পলিইথিলিন ব্যবহার করেছেন তার জন্য তিনি কোন মালচিং পেপার ব্যবহার করেননি। তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করে একটি কোম্পানির মাধ্যমে এই পলিইথিলিন সংগ্রহ করেছেন যার জন্য তার খরচ পড়েছে ৩২,৫০০ টাকা এবং এই পলিইথিলিন জমিতে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ প্রয়োজন

পাখি যাতে ফসল নষ্ট না করে তার জন্য জমিতে জালের ব্যবহার

মনির হোসেনের ক্ষেত্রে

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	মূল্য (কেজি প্রতি)	মোট মূল্য
টিএসপি	৮০	৪০	৩২০০
ভিটামিন	৪০ ফাইল	১২০	৪৮০০
ক্যালসিয়াম	৫০	৬০	৩০০০
জিপসার	৭০	৩০	২১০০
		সর্বমোট খরচ	১২,২৮০

মো. কামরুলের ক্ষেত্রে

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	মূল্য (কেজি প্রতি)	মোট মূল্য
টিএসপি	৭৫	৪০	৩০০০
ভিটামিন	৩৫ ফাইল	১২০	৪২০০
ক্যালসিয়াম	৬০	৫৮	৩৪৮০
		সর্বমোট খরচ	১০,৬৮০

হয়েছে যেমন বিভিন্ন ধরনের স্ট্রিপ, সুতা, বাঁশ ইত্যাদি। এখানে স্ট্রিপের জন্য খরচ হয়েছে ৮০০০ টাকা, সুতার জন্য খরচ হয়েছে ২২,০০০ টাকা ও বাঁশের জন্য খরচ হয়েছে ৯,৮০০ টাকা। মো. কামরুল এই সুতো টমেটো গাছ দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যও ব্যবহার করেছেন। এখানে আপাতদৃষ্টিতে মো. কামরুল অনেক টাকা খরচ করলেও তার এই গঠনটি স্থায়ী। তিনি এই কাঠামোটি মাঝেমধ্যে সংস্কার করে অনেক বছর ব্যবহার করতে পারবেন। কামরুলের এই মাচা তৈরির জন্য ৬ জন শ্রমিক দৈনিক ৬৫০ টাকা গড় মজুরিতে ৮ দিন কাজ করেছেন।

সার ব্যবহার: মনির হোসেন জৈব সারের মধ্যে শুধু গোবর ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন ধরনের অজৈব সার ব্যবহার করেছেন। মো. কামরুলও জৈব সার ব্যবহার করেছেন তবে তার অধিকাংশই নিজের গরুর খামারে উৎপাদিত সার। যেমন:

উপরোক্ত সারসমূহ মনির হোসেন চারা রোপণের ১৫ দিন পর ও কামরুল হোসেন ১২ দিন পর প্রয়োগ করেছেন এবং এজন্য শ্রমিক বাবদ মনির হোসেনের মোট ১৬ জনকে প্রয়োজন হয়েছে যার দৈনিক শ্রমমূল্য ৬০০ টাকা করে। মো. কামরুলের প্রয়োজন হয়েছে ১৫ জন শ্রমিক যার দৈনিক শ্রমমূল্য ছিল ৫০০ টাকা করে।

কীটনাশক ও আগাছা দমন: মনির হোসেন ও মো: কামরুল যে সমস্ত কীটনাশক ব্যবহার করেছেন তা হলো হরমোন, রিডোমিল গোল্ড, টুন্ডা, ইসিসেফ্র, উলালা, কনসিডর, ফ্লোরা, গোল্ডাজিম প্রভৃতি। এর মূল্য ও পরিমাণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

উপরে উল্লিখিত সমস্ত কীটনাশকই স্প্রে মেশিনের সাহায্যে ব্যবহার করা হয়েছে। মনির হোসেনের পূর্বেই দুটি আধুনিক স্প্রে মেশিন ছিল যা তিনি ব্যবহার করেছন। মো. কামরুলের পূর্বে ১ টি স্প্রে মেশিন ছিল এবং পরবর্তীতে আরো ১ টি আধুনিক স্প্রে মেশিন ২২০০ টাকা দামে ক্রয় করেন। মনির হোসেন হরমোন প্রয়োগের জন্য শ্রমিক প্রতি শ্রমমূল্য দিয়েছিল ১০০০ টাকা এবং এই হরমোন প্রয়োগের জন্য তিনি মোট ৮ জন শ্রমিক ২ দিনে নিয়োগ করেছেন। বাকি কীটনাশক প্রয়োগের জন্য তিনি মোট ১০ জন শ্রমিক দিয়ে ৬০০ টাকা শ্রমমূল্যে ১০ দিনে সম্পন্ন করেছেন। কীটনাশক প্রয়োগের জন্য শ্রমিক বাবদ মোট খরচ হয়েছে ৭৬,০০০ হাজার টাকা। কামরুলের টমেটো গাছে হরমোন প্রয়োগের জন্য শ্রমিক প্রতি

মনির হোসেনের ক্ষেত্রে

কীটনাশকের নাম	পরিমাণ	মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)
হরমোন (জোয়ার)	৪০ ফাইল	২০০	৮০০০
রিডোমিল	১৫ ফাইল	১২০	১৮০০
গোল্ডাজিম	৩২ ফাইল	১৩০	৪১৬০
ফ্লোরা	৪০ ফাইল	৯০	৩৬০০
টুন্ডা	৩৬ ফাইল	১২০	৪৩২০
ইসিসেফ্র	৩০ ফাইল	১৬০	৪৮০০
কনসিডর	৩৫ ফাইল	১৩০	৪৫৫০
উলালা	২৫ ফাইল	১৫০	৩৭৫০
		সর্বমোট খরচ	৩৪,৯৮০

মো. কামরুলের ক্ষেত্রে

কীটনাশকের নাম	পরিমাণ	মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)
ভলিউম ফ্লেক্সি	২৫ ফাইল	১৪০	৩৫০০
হরমোন (জোয়ার)	২৬ ফাইল	২০০	৫২০০
রিডোমিল	১১ ফাইল	১২০	১৩২০
গোল্ডাজিম	২১ ফাইল	১৩০	২৭৩০
ফ্লোরা	২৮ ফাইল	৯০	২৫২০
টুন্ডা	২৮ ফাইল	১২০	৩৩৬০
		সর্বমোট খরচ	২২,৪১০

মূল্য ছিল ১০০০ টাকা এবং এই হরমোন তিনি ১০ জন শ্রমিক দিয়ে ২ দিনে প্রয়োগ করেছেন। বাকি কীটনাশক প্রয়োগের কাজ মোট ১২ জন শ্রমিক দৈনিক ৫০০ টাকা শ্রমমূল্যে ৮ দিনে সম্পন্ন করেছেন। কীটনাশক প্রয়োগের জন্য মো. কামরুলের শ্রমিক বাবদ মোট খরচ হয়েছে ৬৮,০০০ টাকা। এছাড়াও আগাছা দমনের জন্য মনির হোসেনের ক্ষেত্রে ৪ জন শ্রমিক (মহিলা) ৩৫০ টাকা শ্রমমূল্যে ১৬ দিন কাজ করেছেন।

সেচ: মনির হোসেন ও মো. কামরুল মোট ৩টি সেচ প্রদান করেছিলেন। সেচ এর জন্য মনির হোসেনের মোট ২৪০০ টাকা খরচ হয়েছে এবং কামরুলের খরচ হয়েছে ২৫০০ টাকা।

ফসল তোলা: মনির হোসেন চারা রোপণের প্রায় ২ মাস পর থেকে অর্থাৎ ১ জুলাই ২০২২ থেকে ফসল তোলা শুরু করেন। প্রথম দিকে মনির হোসেন কিছু কাঁচা টমেটো বাজারে বিক্রি করেছেন। অন্যদিকে মো. কামরুল তার জমি থেকে ০৮ আগস্ট ২০২২ থেকে ফসল তোলা শুরু করেন। সাধারণত গড়ে ৮ থেকে ৯ দিন পর পর ফসল তোলা হতো। মনির হোসেন ১১ বার এবং মো. কামরুল ১৭ বার তাদের জমি থেকে ফসল তুলেছেন। ফসল তোলার জন্য দৈনিক ভিত্তিতে তারা শ্রমিক নিয়োগ দিতেন। ফসল তোলার জন্য মনির হোসেনের শ্রমিক বাবদ মোট ৩০,০০০ টাকা খরচ হয়েছে এবং মো. কামরুলের ৪২,০০০ টাকা খরচ হয়েছে। মনির হোসেন সেপ্টেম্বর '২২ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অর্থাৎ ১৪ তারিখ পর্যন্ত ফসল তুলতে পেরেছিলেন এবং মো. কামরুল ২০শে নভেম্বর '২২ তারিখ পর্যন্ত ফসল সংগ্রহ করেছেন। এর ফলে এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় দুজনের ফসলের স্থায়ীত্বকাল এক নয়। মনির হোসেন মালচিং পেপার ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে তার পুরো জমিতে বৃষ্টির পানি আটকে যায় যার জন্য তার টমেটোর গাছসহ সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে মো. কামরুলের এলাকাতেও বৃষ্টিপাত হয়েছিল তবে তিনি যেহেতু পলিইথিলিন নামক পলিথিন দিয়ে তার পুরো জমিতে মাচা দিয়েছেন, তার ফসলের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

ফসল বিক্রি: মনির হোসেন তার উৎপাদিত ফসল নিকটবর্তী নিমসার বাজারে বিক্রি করেন। ১০-১২ দিন পর পর তিনি ফসল বিক্রি করেন। মো. কামরুল তার ফসল নিকটবর্তী লালপুর বাজারে বিক্রি করতেন। ফসল বাজারে নিয়ে যাবার জন্য তারা উভয়েই ক্রেট ব্যবহার করতেন। মনির হোসেন সর্বমোট ২০০টি ক্রেট ক্রয় করেছেন ২০,০০০ টাকা দিয়ে যা পরবর্তীতে তিনি ১৬,৫০০ টাকায় বিক্রি করে দেন। মনির হোসেন তার সমস্ত ফসল বাজারে নিয়ে যাবার জন্য ১২,৫০০ টাকা খরচ করেছেন। মো. কামরুল পূর্বেই ১৫০টি ক্রেট

জমি থেকে ফসল তোলা ও ক্রেট ব্যবহার করা কার্যক্রম

১২,০০০ টাকা মূল্যে তার ফসল বাজারে নিয়ে যাবার জন্য ক্রয় করেছিলেন। মনির হোসেন তার উৎপাদিত ফসল বিক্রির প্রথম দিকে ১৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি করেন। মাঝের দিকে ৬০ টাকা এবং সর্বশেষে ৯৫ টাকা কেজিতে তিনি ফসল বিক্রি করেন। কামরুল তার উৎপাদিত ফসল প্রথমে ১৫৫ টাকা কেজি, মাঝখানে ৭২ টাকা কেজি এবং সর্বশেষ ১০০ টাকা কেজিতে বিক্রি করেন। মো. কামরুল তার উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে যাবার জন্য অটো খরচ বাবদ ব্যয় করেছেন ১৬,৫০০ টাকা।

উৎপাদন: মনির হোসেনের মোট উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ছিল ৪,৯৯০ কেজি। এর মধ্যে তিনি বাজারে বিক্রি করেছেন ৪,৮০০ কেজি এবং বাকি ১৯০ কেজি তিনি নিজে খাওয়ার ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে দিয়েছেন এবং মো. কামরুলের মোট উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ছিল ৭,১৮৭ কেজি। এর মধ্যে তিনি বাজারে বিক্রি করেছেন ৬,৯০০ কেজি এবং তিনি নিজে খাওয়া ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে দিয়েছেন ২৮৭ কেজি। মনির হোসেনের নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসলের পরিমাণ ছিল ২,২৫০ কেজি। অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে মূলত এ ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। মনির হোসেন সর্বমোট ফসল বিক্রি করেছেন ৪,০৩,৪৮০ টাকা। মো. কামরুলের কোন ফসল নষ্ট হয়নি। মো: কামরুল সর্বমোট ফসল বিক্রি করেছেন ৭,১৩,৭৫০ টাকার। এর মধ্যে প্রথম ১,৮৮৫ কেজি ফসল ১৫৫ টাকা দরে, মাঝের ৩,৫০০ কেজি ৭৫ টাকা দরে এবং শেষের ১,৫১৫ কেজি ১০৫ টাকা দরে বিক্রি করেছেন।

মনির হোসেন ও মো. কামরুল এবারই প্রথম গ্রীষ্মকালীণ টমেটো চাষ করেছেন। মনির হোসেন ও মো. কামরুল বলেন

তারা কেউই ফসলের ন্যায্য মূল্য পাননি। কারণ ফসল বিক্রির মাঝামাঝি সময়ে ইন্ডিয়ান টমেটো বাজারে চলে আসে যা স্থানীয় ভাষায় এলসি বলা হয়। আমদানিকৃত এ টমেটোর সাথে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত ফসলের পার্থক্য হলো আমদানিকৃত টমেটো দেখতে অনেকটা সুন্দর ও আকারে বড় এবং স্থানীয় কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত টমেটো কাঁচাপাকা থাকার কারণে তার মূল্য কমে যায়।

মনির হোসেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দুই কারণে। ১৫-০৯-২২ হতে ১৭-০৯-২২ পর্যন্ত টানা ৩ দিন অতিবৃষ্টির কারণে মনির হোসেনের সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে মনির হোসেন শ্রমিকদের মাধ্যমে টমেটোর ফুলে যে হরমোন স্প্রে করেছিলেন তা সঠিকভাবে স্প্রে কার হয়নি। যার জন্য অনেক ফুল ঝরে পড়ে যায়। অতিরিক্ত তাপমাত্রায় অনেক সময় পরাগায়নে ব্যাঘাত ঘটে বলে পরাগায়নের জন্য এই হরমোন স্প্রে করতে হয়। যার জন্য প্রয়োজন দক্ষ শ্রমিকের। মনির হোসেনের ভাষ্যমতে সঠিকভাবে হরমোণ স্প্রে করতে না পারার কারণে ফুল ঝরে গিয়েছে এবং তা ফসল উৎপাদনে অনেকটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে।

মনির হোসেন আরো বলেন, জুলাই মাসের প্রথম দিকে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করলে অর্থাৎ আষাঢ় মাসে চাষ করলে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত ফসল পাওয়া যায় এবং উৎপাদিত ফসলের বাজার মূল্য অনেক বেশি থাকে।

মনির হোসেনের আয়-ব্যয়ের হিসাব: গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে মনির হোসেন বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় করেছেন এবং টমেটো বিক্রি করে যে টাকা পেয়েছেন তা নিম্নের তালিকায় দেখানো হল। মনির হোসেন গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় করেছেন ৩,৬৪,৮৬০ টাকা এবং মোট বিক্রি করেছেন ৪,০৩,৪৮০ টাকা। এতে মনির হোসেনের লাভ দাঁড়ায় ৩৮,৬২০ টাকা। তিনি তার কায়িক শ্রম ৬০,০০০ টাকা মোট ব্যয়ের সাথে যোগ করলে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে মনির হোসেনের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২১,৩৮০ টাকা।

২০২২ সালে মনির হোসেনের গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের আয় ব্যয়ের হিসাব

ক্র. নং	খরচের বিবরণী	প্রকৃত খরচ (৭২ শতাংশ জমিতে)	একর প্রতি খরচ	প্রকৃত বিক্রয় মূল্য	একর প্রতি সম্ভাব্য বিক্রয় মূল্য	লাভ/ক্ষতি
০১	ট্রাক্টরের মাধ্যমে চাষ	১২,০০০	১৬,৬৬৭	৪,০৩,৪৮০	৫,৬০,৩৮৯	
০২	সার বাবদ সর্বমোট মূল্য	২৫,৩৮০	৩৫,২৫০			
০৩	চারার মূল্য	৬৪,০০০	৮৮,৮৮৯			
০৪	চারা নিয়ে আসার জন্য পরিবহন খরচ	১৫,০০০	২০,৮৩৩			
০৫	মালচিং পেপার	২৩,০০০	৩১,৯৪৫			
০৬	মুলি	৩২,০০০	৪৪,৪৪৪			
০৭	সুতা	২,০০০	২,৭৭৮			
০৮	জাল	১৪,০০০	১৯,৪৪৪			
০৯	মোট শ্রমমূল্য	১,৩০,০০০	১,৮০,৫৫৬			
১০	কীটনাশক	৩৪,৯৮০	৪৮,৫৮৩			
১১	ফসল বাজারে নিয়ে যাবার পরিবহণ খরচ	১,৩০,০০০	১,৮০,৫৫৬			
	সর্বমোট	**৩,৬৪,৮৬০**	**৫,০৬,৭৫০**	**৪,০৩,৪৮০**	**৫,৬০,৩৮৯**	**৩৮,৬২০**

* খরচের বিবরণীর সর্বমোট মূল্যে নিজস্ব শ্রম ৬০,০০০ টাকা যোগ করা হয়নি।

মো. কামরুলের আয়-ব্যয়ের হিসাব: গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে কামরুল বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় করেছেন এবং টমেটো বিক্রি করে যে টাকা পেয়েছেন তা নিম্নের তালিকায় দেখানো হলো। এতে দেখা যায় যে, কামরুল গ্রীষ্মকালীন টমেটোর জন্য মোট ব্যয় করেছেন ৩,৮৫,২৭৬ টাকা এবং মোট বিক্রি করেছেন ৭,১৩,৭৫০ টাকা। এতে তার লাভ হয়েছে ৩,২৮,৪৭৪ টাকা। নিজস্ব শ্রমমূল্য ব্যয়ের সাথে যোগ করলে মো. কামরুলের মোট লাভের পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ২,৮৩,৪৭৪ টাকা।

মো. কামরুলের গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব ২০২২

ক্র. নং	খরচের বিবরণী	প্রকৃত খরচ (৬০ শতাংশ জমিতে)	একর প্রতি খরচ	প্রকৃত বিক্রয় মূল্য	একর প্রতি সম্ভাব্য বিক্রয় মূল্য	লাভ/ক্ষতি
০১	ট্রাক্টরের মাধ্যমে চাষ	১০,৭০০	১৭,৮৩৩			
০২	সার বাবদ সর্বমোট মূল্য	২২,৬৬৬	৩৭,৭৭৭			
০৩	চারার মূল্য	৫৭,০০০	৯৫,০০০			
০৪	চারা নিয়ে আসার জন্য পরিবহণ খরচ	৪,৫০০	৭,৫০০			
০৫	পলিইথিলিন নামক পলিথিন	৩২,৫০০	৫৪,১৬৭			
০৬	স্ট্রিপ	৮০০০	১৩,৩৩৩	৭,১৩,৭৫০	১১,৮৯,৫৮৩	
০৭	সুতা	২২,০০০	৩৬,৬৬৭			
০৮	বাঁশ	৯,৮০০	১৬,৩৩৩			
০৯	মোট শ্রমমূল্য	১,৭৯,২০০	২,৯৮,৬৬৭			
১০	কীটনাশক	২২,৪১০	৩৭,৩৫০			
১১	ফসল বাজারে নিয়ে যাবার পরিবহণ খরচ	১৬,৫০০	২৭,৫০০			
	সর্বমোট	**৩,৮৫,২৭৬**	**৬,৪২,১২৭**	**৭,১৩,৭৫০**	**১১,৮৯,৫৮৩**	**৩,২৮,৪৭৪**

* খরচের বিবরণীর সর্বমোট মূল্যে নিজস্ব শ্রম ৪৫,০০০ টাকা যোগ করা হয়নি।

মনির হোসেন ও মো. কামরুলের একর প্রতি ফলন ও আয়-ব্যয়

ফলন: মনির হোসেন গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করেছেন ৭২ শতক জমিতে আর মো. কামরুল করেছেন ৬০ শতক জমিতে। মনির হোসেন ফলন পেয়েছেন ৪,৯৯০ কেজি আর মো. কামরুল পেয়েছেন ৭,১৮৭ কেজি। তাদের এই ফলনকে যদি একর প্রতি হিসাব করা হয় তাহলে মনির হোসেনের ফলন দাঁড়ায় ৬,৯৩০ কেজি বা ১৮৫.৬৯ মণ ও মো. কামরুলের ১১,৯৭৮ কেজি বা ৩২০.৯৫ মণ। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ২০২০-২০২১ সালের বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ হয়েছিল ১০,৭৪৫ একর জমিতে আর গড় ফলন ছিল একর প্রতি ১৩,২৭১ কেজি বা ৩৫৫.৬৪ কেজি। সে তুলনায় মো. কামরুলের ফলনও ছিল গড় ফলনের নিচে আর মনির হোসেনের ছিল আরও অনেক কম।

আয়-ব্যয়: আমরা মনির হোসেন ও মো. কামরুলের একর প্রতি সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব আনুপাতিক হারে প্রদান করেছি যেমন ধরা যাক মনির হোসেন ৭২ শতক জমিতে ট্রাক্টরের মাধ্যমে চাষ বাবদ খরচ করেছেন ১২,০০০ টাকা যা একরে হিসাব করলে হয় (১২০০০/৭২x১০০)= ১৬,৬৬৬.৬৬ যা ১৬,৬৬৭ টাকা ধরে হিসাব করা হয়েছে। মনির হোসেনের ৭২ শতক জমিতে টমেটোর চাষাবাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব একর প্রতি রূপান্তর করলে দেখা যায় যে, এক একরে ব্যয় হয়েছে ৫,০৬,৭৫০ টাকা আর আয়ের পরিমাণ ৫,৬০,৩৮৯ টাকা। এতে লাভ দাঁড়ায় ৫৩,৬৩৯ টাকা। এ হিসাবের মধ্যে তার নিজস্ব কায়িক শ্রমের ৬০,০০০ টাকা ধরা হয়নি। মো. কামরুলের ৬০ শতক জমিতে টমেটোর চাষাবাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব একর প্রতি রূপান্তর করলে দেখা যায় যে, এক একরে ব্যয় হয়েছে ৬,৪২,১২৭ টাকা আর আয়ের পরিমাণ ১১,৮৯,৫৮৩ টাকা। এতে লাভ দাঁড়ায় ৫,৪৭,৪৫৬ টাকা। এ হিসাবের মধ্যে তার নিজস্ব কায়িক শ্রমের ৪৫,০০০ টাকা ধরা হয়নি।

উপসংহার: মো. কামরুল ও মনির হোসেনের প্লটে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের বৃত্তান্ত উপরে বর্ণনা করা হলো। তারা দুজন একই সময়ে চারা রোপণ করে মো. কামরুল ফসল তুলেছেন ২০ শে নভেম্বর। ২০২২ পর্যন্ত আর মনির হোসেনের বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি শেষ টমেটো তুলেছেন ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত। অর্থাৎ মো. কামরুলের টমেটো ফসল মাঠে ছিল আরো ৬৭ দিন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মনির হোসেন অন্য একটি ফসল তার জমিতে চাষ করে নিয়েছেন। সে ফসলটি হলো ধনিয়া। টমেটো ফসল নষ্ট হওয়ার দুই

সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ অক্টোবর মাসের ১০ তারিখে তিনি জমিতে ধনিয়ার বীজ রোপণ করে শুরু করে ১০ই নভেম্বরের মধ্যে ধনিয়া তুলে বিক্রি করে ফেলেন। আর মো. কামরুল টমেটো তোলেন ২২শে নভেম্বর পর্যন্ত। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মো: কামরুল টমেটো চাষে যে সময় নিয়েছেন, মনির হোসেন একই সময়ে গ্রীষ্মকালীন টমেটো (নষ্ট হওয়ার পর) ও ধনিয়া দুটি ফসল তুলেছেন। কিন্তু তাতে আর্থিকভাবে তিনি তার ক্ষতির পরিমাণ কতটা পুষিয়ে নিতে পেরেছেন? আমরা যেহেতু ধনিয়ার চাষ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব রেখেছি, তাই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজব নিচের বর্ণনায়।

মনির হোসেনের প্লটে ধনিয়া চাষ ও আয়-ব্যয়

জমি প্রস্তুতি: মনির হোসেন গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষাবাদের পরবর্তী সময়ে ২ সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তার জমি পুরোপুরি পরিষ্কার করে ফেলেন। যেহেতু গ্রীষ্মকালীন টমেটো তিনি বেড পদ্ধতিতে করেছিলেন তার জন্য ধনিয়া চাষের জমি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আরো সহজতর হয়েছে। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে তার জমিতে শ্রমিকের মাধ্যমে হালকা চাষ দেন এবং বেডগুলো আরো ভালোভাবে তৈরি করেন। এতে ৩ দিনে সর্বমোট ১৭ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছে এবং মনির হোসেনের সর্বমোট খরচ হয়েছে ৮,৫০০ টাকা। জমি প্রস্তুতির সময় তিনি ৪৭০ কেজি কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করেছেন যার মূল্য (৪৭০x১২)= ৫,৬৪০ টাকা, টিএসপি দিয়েছেন ৫৪ কেজি যার মূল্য (৫৪x৩০)= ১,৬২০ টাকা এবং এমওপি প্রয়োগ করেছেন ১৬ কেজি যার মূল্য (১৬x২৪)=৩৮৪ টাকা। সর্বমোট খরচ হয়েছে ৫,৬৪০+১,৬২০+৩৮৪= ৭,৬৪৪ টাকা।

বীজ সংগ্রহ: মনির হোসেন হাইব্রীড জাতের ধনিয়া বীজ মরক্কো ৪২০ টাকা প্রতি প্যাকেট করে ১০ প্যাকেট (প্রতি প্যাকেটে বীজের পরিমাণ ০১ কেজি বা ১,০০০ গ্রাম) নিমসার বাজার থেকে ক্রয় করেছেন। ধনিয়া পাতার বীজ সংগ্রহ করতে তার কোন সমস্যা হয়নি। ১০-১০-২০২২ তারিখে তার জমিতে ধনিয়ার বীজ বপন করেন। বীজ বপনের জন্য ৮ জন শ্রমিক নিয়েছেন যাদের দৈনিক শ্রমমূল্য ৫০০ টাকা করে মোট খরচ হয়েছে ৪,০০০ টাকা।

আন্তঃফসল পরিচর্যা:

সার প্রয়োগ: চারা রোপণের ১২ দিন পর তিনি দ্বিতীয় কিস্তিতে সার প্রয়োগ করেন। সার প্রয়োগের কাজটি তিনি ও তার পুত্র তারেক হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে করেছেন। এ সময়ে যে সমস্ত সার ব্যবহার করেছেন তা হলো ৫০ কেজি ইউরিয়া সার যার মূল্য (৫০x২৯)= ১,৪৫০ টাকা, ১৬ কেজি এমওপি প্রয়োগ করেছেন যার মূল্য (১৬x২৪)= ৩৮৪ টাকা, সর্বমোট মূল্য (১,৪৫০+৩৮৪)= ১,৮৩৪ টাকা।

সেচ: মনির হোসেন তার জমিতে মোট ০৩টি সেচ প্রদান করেছেন এবং সেচের জন্য সর্বমোট ১,৮০০ টাকা খরচ করেছেন।

আগাছা ও কীটনাশক দমন: কীটনাশক দমনের জন্য তিনি শ্রমকি নিয়োগ করেছিলেন তাদের মাধ্যমেই তিনি আগাছা দমন ও জমি আলগা করার মত কাজটি করিয়ে নিয়েছেন। তিনি তার ধনিয়ার জমিতে শুধুমাত্র শোষক পোকা দমনের জন্য কিছু কীটনাশক ব্যবহার করেছেন যেমন ১০ ফাইল টিডো ১০০ মিলি ব্যবহার করেছেন যার মূল্য ছিল (১০x৩৯৪)= ৩,৯৪০ টাকা ১৪ ফাইল পেন্ডুলাম ৩৩ ইসি ব্যবহার করেছেন যার মূল্য (১৪x১১৫)= ১,৬১০ টাকা। সর্বমোট (৩,৯৪০+১,৬১০)= ৫,৫৫০ টাকার কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়েছে।

তিনি ধনিয়া চাষের ক্ষেত্রে সর্বমোট ৫,৫৫০ টাকার কীটনাশক খরচ করেছেন। এই কীটনাশকগুলি স্থানীয় নিমসার বাজার থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং কীটনাশক সংগ্রহে তার কোন অসুবিধা হয়নি। কীটনাশক প্রদানের জন্য মোট ২ দিনে ৩ জন করে শ্রমিক নিয়েছেন এবং ৫০০ টাকা করে ৬ জন শ্রমিকের জন্য খরচ হয়েছে ৩০০০ টাকা।

ফসল সংগ্রহ: তিনি চারা রোপণের ২৬ দিন পর থেকে ফসল সংগ্রহ করা শুরু করেন। তিনি ০৫-১১-২০২২ হতে ১০-১১-২০২২ পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ দিনের প্রতিদিনই শ্রমিকদের মাধ্যমে ফসল সংগ্রহ করতেন এবং প্রতিদিনই বাজারে বিক্রি করেছেন। তিনি সর্বমোট ৩,০৩১ কেজি ধনিয়া পাতা বাজারে বিক্রি করেছেন। প্রথম ১৩৮৯ কেজি ধনিয়া পাতা ৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেছেন। পরবর্তী ৯৫০ কেজি ৫২ টাকা দরে এবং পরবর্তী ৬১৩ কেজি ধনিয়া পাতা ৪২ টাকা কেজিতে বিক্রি করেছেন। তিনি সর্বমোট ১,৩৭,৬৫১ টাকার ধনিয়া পাতা বিক্রি করেছেন। তার ফসল সংগ্রহের জন্য ৬ দিনে মোট ১১ জন শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছেন এবং ৫০০ টাকা করে সর্বমোট খরচ করেছেন ৫৫০০ টাকা।

ধনিয়া চাষের ক্ষেত্রে আয় ব্যয়ের হিসাব: মনির হোসেন ধনিয়া চাষের জন্য মোট ব্যয় করেছেন ৪৪,৫২৮ টাকা অর্থাৎ একর প্রতি খরচ হয়েছে ৬১,৮৪৪ টাকা। তিনি মোট ফসল বিক্রি করেছেন ১,৩৭,৬৫১ টাকা যা একরে হিসেব করলে হয় ১,৯১,১৮২ টাকা। নিজস্ব শ্রমসহ তিনি আয় করেছেন ৮৫,১২৩ টাকা যা একরে হিসেব করলে হয় ১,১৮,২২৬ টাকা এবং নিজস্ব শ্রম ব্যতীত আয় ৯৩,১২৩ টাকা যা একরে হিসেব করলে হয় ১,২৯,৩৩৮ টাকা। বিস্তারিত নিচের তালিকায় দেখানো হল।

ক্র. নং	খরচের বিবরণী	প্রকৃত খরচ (৭২ শতাংশ জমিতে)	একর প্রতি খরচ (টাকা)	প্রকৃত বিক্রয় মূল্য	একর প্রতি সম্ভাব্য বিক্রয় মূল্য	লাভ/ক্ষতি
০১	শ্রমিক এর মাধ্যমে নিড়ানী ও বেড তৈরী	৮,৫০০	১১,৮০৬	১,৩৭,৬৫১	১,৯১,১৮১	
০২	সার বাবদ সর্বমোট খরচ	৯,৪৭৮	১৩,১৬৪			
০৩	বীজের মূল্য	৪,২০০	৫,৮৩৩			
০৪	কীটনাশক	৫,৫৫০	৭,৭০৮			
০৫	মোট শ্রমমূল্য	১২,৫০০	১৭,৩৬১			
০৬	সেচ	১৮০০	২৫০০			
০৭	ফসল বাজারে নিয়ে যাবার জন্য খরচ	২,৫০০	৩,৪৭২			
	সর্বমোট	**৪৪,৫২৮**	**৬১,৮৪৪**	**১,৩৭,৬৫১**	**১,৯১,১৮২**	**৯৩,১২৩**

* খরচের বিবরণীর সর্বমোট মূল্যে নিজস্ব শ্রম ৮,০০০ টাকা যোগ করা হয়নি।

লাভক্ষতির পরিমাণ

আমরা এ পর্যন্ত মনির হোসেন ও মো. কামরুলের যে বিবরণী তুলে ধরেছি তাতে দেখা যায় যে মধ্য এপ্রিল ২০২২ থেকে মধ্য নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সাত মাসে মনির হোসেন দুইটি ও মো. কামরুল একটি ফসল ঘরে তুলেছেন। মনির হোসেনের নিজস্ব শ্রম ব্যতীত লাভ করেছেন গ্রীষ্মকালীন টমেটো থেকে ৩৮,৬২০ টাকা ও ধনিয়া চাষ থেকে ৯৩,১২৩ টাকা, সর্বমোট ১,৩১,৭৪৩ টাকা। আর ঐ একই সময়ের মধ্যে মো. কামরুল শুধুমাত্র গ্রীষ্মকালীন টমেটো থেকে লাভ করেছেন ৩,২৮,৪৭৪ টাকা। লাভের দিক থেকে মনির হোসেনের চেয়ে মো. কামরুল ১,৯৬,৭৩১ টাকা বেশি লাভ করেছেন এবং মো. কামরুলের আবাদি জমির পরিমাণ মনির হোসেনের চেয়ে ১২ শতাংশ কম ছিল। আর নিজস্ব শ্রম মূল্য ব্যয়ের সাথে যোগ করলে মনির হোসেনের লাভ কমে দাঁড়ায় ৬৩,৭৪৩ টাকা এবং মো. কামরুলের দাঁড়ায় ২,৮৩,৪৭৪ টাকা।

একর প্রতি হিসাব

এবারে একর প্রতি ফলন দেখা যাক। গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করে মনির হোসেন একর প্রতি ফলন পেয়েছেন ৬,৯৩০ কেজি বা ১৮৯.২০ মণ, অন্যদিকে মো: কামরুল পেয়েছেন একর প্রতি ১১,৯৭৮ কেজি বা ৩২০.১৫ মণ। মো. কামরুলের একর প্রতি ফলনের হার ৭২.৮৪% বেশি। মনির হোসেনের একর প্রতি ফলন কম হওয়ার কারণ কী? আমরা যদি এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করি তাহলে মনির হোসেনের নিজের মতে এর জবাব দু'টি: এক, হরমোন স্প্রে করার ত্রুটির কারণে তার বহু ফসল নষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। এ দুটি কারণ ছাড়া আমরা মনে করি যে মনির হোসেন ইউটিউব দেখে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি কোন প্রশিক্ষণ পাননি কিংবা কাউকে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ করতে দেখেননি অথবা গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ করেছেন এমন কোন কৃষকের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ পাননি। এ জন্য চাষ পদ্ধতিতে বা আন্তঃফসল পরিচর্যায় তার ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে। অন্যদিকে মো. কামরুলের বিদেশের একটি কৃষি খামারে যেখানে গ্রীষ্মকালীন টমেটোসহ অন্যান্য ফসল যেমন সাম্মাম, ক্যাপসিকাম, শশা চাষ হত– এমন একটি খামারে অনেকদিন হাতে কলমে কৃষি কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট মহলের বিবেচনার জন্য একটি প্রস্তাব

এ দু'জন কৃষকের চাষ পদ্ধতি, আয়-ব্যয়ের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বিশেষ করে তাদের একর প্রতি ফলনের হার বিবেচনা করে আমাদের একটি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মহলের বিবেচনার জন্য পেশ করতে চাই। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে দু'জন কৃষকেরই একর প্রতি ফলনের হার জাতীয় গড় ফলনের চাইতে কম। এতে বোঝা যায় যে, সাধারণ কৃষকদের প্রশিক্ষণের কত প্রয়োজন। আমরা লক্ষ্য করি যে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রচুর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সাধারণভাবে এর অধিকাংশই আয়োজন করা হয় বিদেশি সংস্থার অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এবং প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তা এবং প্রকল্পভুক্ত জনগোষ্ঠীই প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত হন।

কিন্তু এখন সম্ভবত সময় এসেছে এ ব্যবস্থাটি পুনর্মূল্যায়ণ করার এবং এতে কিছু পরিবর্তন আনার। আমাদের নির্দিষ্ট প্রস্তাব হচ্ছে যারা কৃষকদের প্রকল্পে অনুদান দেন তারা যদি প্রশিক্ষণের জন্য 'থোক' বরাদ্দ দেন তাহলে এই টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট ফসল চাষের জন্য কেবল মাত্র আগ্রহী কৃষক যারা ঐ ফসল আবাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেন তাদেরই প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণেই অভিজ্ঞ কৃষককে তার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। কেননা বাংলাদেশে এখন কৃষকগণ যে ফসলেরই আবাদ করেন না কেন তারা আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে কার্পণ্য করেন না, যদি তারা তা জানেন। সেজন্যই যিনি যে ফসল উৎপাদন করতে চান তাকে সে ফসলের উপরই প্রশিক্ষণ দিন যেন তিনি সর্বোচ্চ উৎপাদন করতে পারেন।

এ প্রবন্ধটি আমরা এখানেই শেষ করছি। শুরুতে আমরা যা বলেছিলাম, আমরা দুই বছর ব্যাপী তথ্য নিয়েছি মনির হোসেন ও মো. কামরুলের। প্রথম ৭ মাস সময়ের মধ্যে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর (মনির হোসেনের ধনিয়াসহ) পর মনির হোসেন চাষ করেছেন করল্লা এবং মো. কামরুল চাষ করেছেন ক্যাপসিকাম। পরবর্তী সংখ্যায় এই দুটি ফসলের চাষ পদ্ধতি ও আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরব। (*চলবে*)

লেখক: প্রতাপ চন্দ্র রায়, কৃষি কর্মকর্তা, সিদীপ এবং ফজলুল বারি, সম্পাদক, শিক্ষালোক

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক-পাঠিকার পুরস্কার বিতরণ

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫এ সিদীপের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে নাটোরে বড়াইগ্রাম এরিয়ার রাজাপুর শাখার আওতায় রাজাপুর ডিগ্রি কলেজে সেরা পাঠক-পাঠিকার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব ইলিয়াস হাসান উপস্থিত ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বই পড়তে উৎসাহিত করতে সিদীপের এই আয়োজনকে সাধুবাদ জানান। অনুষ্ঠানে কলেজের অন্যান্য শিক্ষক ছাড়াও সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজার সুমি আক্তার এবং প্রধান কার্যালয় থেকে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা গাজী জাহিদ আহ্সান উপস্থিত ছিলেন।

১৬৫ বছরের পথ পরিক্রমা ও আমার স্মৃতি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়

সোহেল রানা ভূঁইয়া

ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি থেকে ১৮৬০ সালে গোড়াপত্তন হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া বঙ্গ বিদ্যালয়ের যা সময়ের পরিক্রমায় কয়েকবার নাম ও স্থান পরিবর্তনের পর বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় নামে গৌরবের সাথে দাঁড়িয়ে আছে।

তৎকালীন ইংরেজ শাসন আমলে ভারত বর্ষের বাঙালি অধ্যুষিত অখণ্ড বাংলা যখন অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যজনিত অন্ধকারে নিমজ্জিত, চলছিল বৃটিশ বেনিয়াদের শোষণ ঠিক তখনই ১৮৬০ সালে পূর্বাঞ্চলীয় অখণ্ড বাংলার ত্রিপুরার নবগঠিত নাসিরনগর মহকুমায় (পরবর্তীতে ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা পায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা) নবীনগর থানার শ্যামগ্রামের শিক্ষানুরাগী তৎকালীন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর বাবু কাশীনাথ রায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার থানা সংলগ্ন পূর্বপার্শ্বে একটি ভাঙ্গাচোরা খড়ের কুঁড়েঘরে এলাকার ছোট ছেলে-মেয়েদের অক্ষরজ্ঞান দেয়া তথা পাঠদানের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম উদ্যোগ নেন। তাঁর এক নিকটাত্মীয় স্বর্গীয় বাবু অম্বিকা চরণ ভট্টাচার্যকে দায়িত্ব দেন প্রধান শিক্ষকের। পরবর্তীতে নাটাই গ্রামের স্বর্গীয় বাবু গুরুদাস দেব হন প্রথম পণ্ডিত। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া বঙ্গ বিদ্যালয়', শুরু হয় অত্র এলাকার প্রথম বিদ্যাপিঠের। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে, অভিভাবকরা আগ্রহী হয়ে উঠেন তাদের সন্তানদের স্বাক্ষরতা ও শিক্ষার জন্য। ফলে সময়ের সাথে সাথে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বাড়তে থাকে। শিক্ষার্থী বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ঐ ছোট ঘরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকা শিক্ষকগণ আরও বৃহৎ স্থানে বিদ্যালয় স্থানান্তরের চিন্তা করেন। এর ফলশ্রুতিতে খুব সম্ভবত ১৮৭৫-৭৬ এর দিকে শহরের মুন্সেফপাড়াস্থ স্থানীয় মুসলিম বোর্ডিংয়ের পূর্বপার্শ্বে বিদ্যালয়টি স্থানান্তর করা হয়। বিদ্যালয় স্থানান্তরের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করেন সরাইল উপজেলার আদৈর গ্রামের স্বর্গীয় বাবু গুরু প্রসাদ চৌধুরী। এছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার প্রথম মহকুমা প্রশাসক (এসডিও) মি. কিলভে এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখেন।

বাঙ্গালিদের মাঝে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব বাড়তে থাকায় সময়ের প্রয়োজনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ বিদ্যালয়টিকে উচ্চ স্তরে ইংরেজি শিক্ষার তাগিদে বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া এম. ই স্কুল (Brahmanbaria M.E School - ব্রাহ্মণবাড়িয়া মিডল ইংলিশ স্কুল)। স্বর্গীয় বাবু আনন্দ কিশোর বর্মন প্রথম প্রধান শিক্ষক এবং স্বর্গীয় বাবু মনোমোহন দাস হন প্রথম প্রধান পণ্ডিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান পরিবর্তনের পর বর্তমান স্থান জেল রোড, পশ্চিম পাইকপাড়ায় স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের পর ১৯৩০ সনে স্বর্গীয় বাবু পুলিন বিহারী বর্মণ ডিসটিংকশন সহ B.A পাশ

করার পর প্রধান শিক্ষক হিসেবে এই বিদ্যালয়ের হাল ধরেন। বাবু পুলিন বিহারী বর্মণের সময় বিদ্যালয়ের সুনাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের সুনাম ছড়িয়ে পড়লে এবং সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষানুরাগী ও এলাকাবাসীর আগ্রহে M.E (Middle English) স্কুলটিকে জুনিয়র স্কুলে উন্নীত করার দাবী জোরদার হয়ে উঠলো। আবেদন করা হলো সরকারি দপ্তরে, সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে ১৯৫২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া M.E স্কুলটিকে উন্নীত করা হলো জুনিয়র স্কুলে, নাম হয় 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়' এবং প্রধান শিক্ষক হিসেবে বহাল রইলেন বাবু পুলিন বিহারী বর্মণ। পরবর্তীতে স্থানীয় মানুষের আগ্রহে এবং বাবু পুলিন বিহারী বর্মণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৫৯ সালে বিদ্যালয়টিকে একটি পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয় এবং নামকরণ হয় 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়'। ১৯৫৯ সালে নবম শ্রেণি এবং ১৯৬০ সালে দশম শ্রেণি খোলা হয়। ১৯৬১ সালে স্কুলের শিক্ষার্থীগণ কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রথমবারের মতো ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং শতকরা ৭২.৩ জন কৃতকার্য হয়। এর মধ্যে ২ জন ১ম বিভাগ (১ জন অংকে এবং ১ জন ইংরেজিতে স্থানীয় পরীক্ষার্থীদের মাঝে ডিসটিংকশন মার্ক লাভে সমর্থ হয়)। ১৯৬৩ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্র মো. আবু তাহের (চন্ডালখিল, উলচাপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া) এস.এস.সি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডে কলা বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান লাভে সমর্থ হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এগিয়ে চলেছে সফলতার সাথে। প্রতিষ্ঠানটি সূচনা লগ্ন থেকেই পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও বিশেষ গৌরবের অধিকারী। ১৯৬১ সালে আন্তঃস্কুল ফুটবল খেলায় বিভিন্ন রেঞ্জ পর্যায়ে জয়লাভ করে প্রাদেশিক পর্যায়ে পাবনা রেঞ্জের সাথে ফাইনাল খেলায় রানার আপ হয়ে বিপুল পরিমাণ পুরস্কার ও উপহার পেয়ে ত্রিপুরা ও সিলেট জেলার মুখ উজ্জ্বল করে এবং এই অঞ্চলের গৌরব ধরে রাখে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও দেড় শতাধিক বয়সী এই বিদ্যাপীঠের অনেক অবদান রয়েছে।

১৮৬০ সালে গোড়াপত্তন হওয়া 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া বঙ্গ বিদ্যালয়' কালের বিবর্তনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে এবং টিকে থেকে জ্ঞানের আলো বিলিয়ে ১৬৫ বছরের পথ পরিক্রমায় চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সফলতা ও গৌরবের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং দেশমাতৃকার তরে হাজার হাজার সৎ, মেধাবী, কর্মঠ ও শিক্ষিত নাগরিক উপহার দেয়।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২৫খ্রিস্টাব্দ, দীর্ঘ ১৬৫ বছরের এই পথ পরিক্রমায় বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, প্রসারণ, রূপান্তরসহ নানাবিধ বিষয়ে যারা অবদান রেখেছেন তাদের নাম কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে স্মরণ করবে এই জনপদের মানুষ। এক একরের বেশি জায়গা জুড়ে স্থাপিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়ের অবকাঠামোতে একতলা ভবন আছে তিনটি, দু'তলা ভবন আছে একটি এবং তিনতলা ভবন আছে একটি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়ের সাথে আমার নিজের স্মৃতিময় সময় আছে পাঁচ বছরের। স্কুলে আমি সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হই ১৯৯৪ সালে এবং ১৯৯৮ সালে এসএসসি তথা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার মাধ্যমে এই স্কুলে পড়ালেখার গণ্ডি শেষ করি। এই পাঁচ বছর ছিলো আমার স্বপ্নময় এবং সোনালি সময়। একটি বিষয় না বললেই নয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি জানতামই না এমনকি চিন্তাও করিনি যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা অন্ধ কোন মানুষ স্কুলে পড়াশোনা করে বা শিক্ষা গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা পড়ালেখা করতে পারে। স্কুলে ভর্তি হয়েই পেলাম ইউসুফ, আজগর, শাহনূরসহ আরো অনেক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা কোন ক্লাসরুম ছিল না, তাঁরা ক্লাস করতো আমাদের সাথেই। তারা পড়ালেখা করতো অন্ধদের পড়াশোনার জন্য আবিষ্কৃত ব্রেইল পদ্ধতিতে যা লুইস ব্রেইল নামে একজন ব্যক্তি আবিষ্কার করেন এবং যা বিশ্বব্যাপী প্রচলিত। স্কুলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী যাদের পেয়েছি তাদের সাথে আমার পথচলা ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। অন্য সহপাঠীরা যেমন তেমন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বন্ধুদের দেখলে বা তাদের সাথে কথা বললেই মানসপটে নিজের অজান্তেই ভেসে উঠে স্কুলের সব সুখস্মৃতি। স্কুল জীবনে আবু জাহের স্যারকে পেয়েছিলাম প্রধান শিক্ষক হিসেবে। অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমাদের। হরেন্দ্র স্যার ইংরেজি খুব ভাল পড়াতেন, স্যারকে সহযোগিতা করার জন্য স্যার প্রায়শই আমাদের কয়েকজনকে বাসায় ডেকে নিতেন। ব্যাপক জনপ্রিয় ইংরেজি গ্রামার বই TVNT সহ বহু পুস্তকের প্রণেতা আইনুল হক স্যার ছিলেন অনন্য সাধারণ। তাছাড়া জামাল স্যার, হারুন স্যার, পঙ্কজ স্যার, কাশেম স্যারসহ সবাই ছাত্রদের প্রতি খুবই যত্নশীল ছিলেন। বর্তমান প্রধান শিক্ষক মোস্তফা কামাল স্যার তখন সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন বছর পাঁচেক আগে। শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি অত্র বিদ্যালয়ের আমার সকল শিক্ষা গুরুদের।

সভ্যতার বিনির্মানে যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আর তারমধ্যে সবচেয়ে আদি প্রতিষ্ঠান হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমাদের প্রাণের বিদ্যাপীঠ ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় ইতিমধ্যেই সফলতা ও গৌরবের সাথে ১৬৫ বছর যাবৎ টিকে আছে, টিকে থাকবে সহস্র বছর; সভ্যতার প্রয়োজনে।

লেখক: বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও সমাজকর্মী

জলপাই

তানভীর আহম্মেদ

জলপাই একটি টক ফল। এটি সিলন অলিভ নামে পরিচিত, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ফল পাওয়া যায়। জলপাই ফলের জন্য বিখ্যাত হলেও এর ফুলের সৌন্দর্য অসাধারণ। সারা গাছজুড়ে অসংখ্য ফুলের যে মেলা বসে, তার সৌন্দর্য উপেক্ষা করা কঠিন। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সাদা রঙের থোকা থোকা ফুলগুলো ফোটে। এই ফুলের মধু অনেকটা উপকারিও বটে। জলপাই ফলটি খাবার উপযোগী হয় শরৎ-হেমন্তে। তখন ফলের বাইরের আবরণ সবুজের কাছাকাছি একটি বিশেষ রঙ ধারণ করে। এ কারণে জলপাই রঙ সবার কাছে একটি বিশেষ রঙ হিসেবে পরিচিত। একটি ফলের ওজন ১৫.৭৮ থেকে ২২.৪৬ গ্রাম হয়ে থাকে। কাঁচা জলপাইয়ের কথা শুনতেই যেন জিভে পানি চলে আসে তাই তো কবিতার সুরে সঞ্চয়িতা রায় বলেছেন।

জল নাহি আজ চাই
খাবো আজ জলপাই।
সবুজ সবুজ কাঁচা কাঁচা
খাসা খাসা বাছা বাছা।
চোখে যখন দেখি তাই
জিভে জল আইঠাই।

ব্যবহার

জলপাইয়ের মোরব্বা, বোরহানী, বিভিন্ন রকমের আচার এবং আমাদের গ্রামঞ্চলে কেউ বা আবার খাট্টা রান্না করে ভাতের সাথে খায়।

জলপাইয়ের কিছু উপকারিতা

পরিপাক ক্রিয়া: নিয়মিত জলপাই খেলে গ্যাস্ট্রিক-আলসার কম হয়। জলপাইয়ের খোসায় রয়েছে প্রচুর আঁশ, যা খাবার হজমে সাহায্য করে।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়: জলপাইয়ের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। যখন কোনো মানুষের রক্তে ক্ষতিকর মুক্ত কণিকা ও কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি থাকে। ফলে জলপাইয়ের তেল হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়।

ক্যানসার প্রতিরোধে: জলপাই ভিটামিন-ই-এর অন্যতম একটি উৎস; যা শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে করে এবং কোষের অস্বাভাবিক গঠনে বাধা দেয় বলে ক্যানসারের ঝুঁকি কমে।

প্রতি ১০০ গ্রাম জলপাইয়ের পুষ্টিগুণ

উপাদান	পরিমাণ
খাদ্যশক্তি	৭০ কিলোক্যালরি
শর্করা	৯.৭ মিলিগ্রাম
ক্যালসিয়াম	৫৯ মিলিগ্রাম
ভিটামিন সি	১৩ মিলিগ্রাম

ত্বক ও চুলের যত্নে: জলপাইয়ের তেলে রয়েছে ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ত্বক ও চুলের যত্নে কাজ করে। জলপাইয়ের তেল চুলের গোড়ায় লাগালে চুলের গোড়া মজবুত হয়। এতে চুল পড়ার সমস্যা দূর হয়।

হাড়ের ক্ষয়রোধ: জলপাইয়ের মনো স্যাচুরেটেড চর্বিতে থাকে প্রদাহবিরোধী উপাদান। বয়সের কারণে অনেকেরই হাড়ের ক্ষয় হয়। হাড়ের ক্ষয়রোধ করে জলপাই তেল।

লৌহের ঘাটতি: জলপাই লৌহের আরও একটি উৎস। রক্তের লোহিত কণিকা অক্সিজেন পরিবহন করে। শরীরে লৌহের অভাব পূরন করে।

চোখের যত্নে: জলপাইয়ে ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। ভিটামিন-এ চোখের জন্য ভালো। যাঁদের চোখ আলো ও অন্ধকারে সংবেদনশীল, তাঁদের জন্য জলপাইয়ে রয়েছে অনেক উপকারীতা । এ ছাড়া জীবাণুর আক্রমণ, চোখ ওঠা, চোখের পাতায় সংক্রমণজনিত সমস্যা দূর করে।

পিত্তথলিতে পাথর: নিয়মিত জলপাই খেলে পিত্তথলির পিত্তরস ঠিকভাবে কাজ করে। পিত্তথলিতে পাথর হওয়ার প্রবণতা কমে যায়।

ডায়াবেটিস: জলপাই রক্তের চিনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ফলে ডায়াবেটিসও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: জলপাই প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে। সর্দি, জ্বর ইত্যাদি দূরে থাকে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

লেখক: উপ সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার,
সিদীপের সিএন্ডবি বাজার ব্রাঞ্চ, পাবনা

আমার এলাকায় সেচ্ছাসেবামূলক উন্নয়নকর্ম

নিবেদিত-প্রাণ একটি সংগঠনের কথা

কাকলী খাতুন

সমাজের অবহেলিত সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র তথা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, মানবিক অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সমাজকর্মী হলো সমাজের এক নিবেদিত-প্রাণ মানুষ। "মানুষ মানুষের জন্য" এ চিরন্তন সত্য বাণীটুকু হৃদয়ে মননে লালন করে ২০১৬ সালের মার্চ মাসে পাবনার বেড়া উপজেলার ঐতিহ্যবাহী বিপিন বিহারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থী মেহেরাব হোসেন জীম তার ৫ জন বন্ধুকে নিয়ে শিক্ষার্থী সহযোগিতা সংগঠন নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সিদ্ধান্ত হয় এই ৫ জন শিক্ষার্থী টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে তা মানব কল্যাণের কাজে লাগাবে। এভাবেই মূলত শুরু হয় শিক্ষার্থী সহযোগিতা সংগঠনের যাত্রা। তারা প্রোগ্রামের আগে তাদের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৫-১০ টাকা করে চাঁদা তুলতো। মাত্র ৫০০ টাকা দিয়ে তারা সংগঠনের প্রথম প্রোগ্রাম করেন। মেহেরাব ১০০ টাকা, তার বোন ১০০ টাকা, তার ক্লাসের আর বাকি বন্ধুরা মিলে ৩০০ টাকা দেয়। তারা এই ৫০০ টাকা দিয়ে ১০ জন গরীব অসহায় মানুষদের ময়দা, সেমাই কিনে দিয়ে শুরু করে সংগঠনের কার্যক্রম। মানবতাপ্রেমী এ সংগঠনটি ইতিমধ্যে প্রায় ৮ বছর পার করেছে। তাদের সদস্য সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়েছে। ইতিমধ্যে তারা একে একে বাস্তবায়ন করেছে বেশ কিছু কর্মসূচি। এই সময়ের মধ্যে তারা দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান থেকে শুরু করে এতিমখানায় খাদ্যের যোগান ও দুস্থদের নানাভাবে সাহায্য করে চলেছে এবং ২টি ভ্রাম্যমান পাঠাগার করতে সক্ষম হয়েছে। যেখানেই মানুষের অসহায়ত্বের খবর পান সেখানেই তারা ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

এ পর্যন্ত সংগঠনটি কয়েকশত শিক্ষার্থীকে আর্থিক সহায়তাসহ নানা রকমের সহায়তা প্রদান করেছে। পাশাপাশি দুস্থ মানুষদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী, চিকিৎসাসেবা ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে। করোনার সময় দুস্থ ব্যক্তির বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বেড়া পৌর এলাকার কয়েকটি ওষুধের দোকানে রক্তচাপ মাপার যন্ত্র, ডায়াবেটিস মাপার যন্ত্র এবং নেবুলাইজার কিনে দেওয়া হয়েছে।

এসব ওষুধের দোকানে প্রকৃত দুস্থ রোগীরা বিনামূল্যে সেবা নিতে পারছে। অসহায় কারো ওষুধের প্রয়োজন হলে সংগঠনের পক্ষ থেকে অনেক সময় তা কিনেও দেওয়া হচ্ছে। ২০২০ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত বছরে ৩ বার গরীব অসহায় মানুষের মাঝে ৫০০ প্যাকেট ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়াও করোনার সময়ে এতিমখানায় খাবারের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে তাদের জন্য পুরো রমজান মাস ইফতারির আয়োজন করে থাকে সংগঠনটি। শিক্ষার্থী সহযোগিতা সংগঠনটি নদীপাড়ের কয়েকশত মানুষের পারাপারের জন্য নদীর মধ্যে ৫৫০ হাত সাঁকো নির্মাণ করেছে। যাতে উপকৃত হচ্ছে নদী পারের কয়েক হাজার মানুষ।

এছাড়াও নদীপাড়ের মেয়েদের জন্য স্যানেটারি ন্যাপকিনের ব্যবস্থা করেছে এবং তাদের এই সময়ে শরীরের যত্নের কথা বুঝিয়ে দেন সংগঠনটির মেয়ে সেচ্ছাসেবকরা। এছাড়াও সংগঠনটির একটি দল করোনাকালীন সময়ে ফ্রি ভ্যাকসিন নিবন্ধনের কাজ করেছে চরের মানুষদের কাছে গিয়ে। শিক্ষার্থী সহযোগীতা সংগঠনটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি কার্যক্রমও পরিচালনা করে। তারা বিভিন্ন এলাকায় কয়েক হাজার বৃক্ষ রোপণ করেছে। এছাড়াও তাদের ২টা শিক্ষার্থী সহযোগীতা ভ্রাম্যমান পাঠাগার রয়েছে যেটি বিভিন্ন স্কুলে প্রতিনিয়ত যাচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের বই পড়ার আগ্রহ বাড়ছে। সংগঠনটি এখন স্কুল শিক্ষার্থীদের অসামাজিক অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরিয়ে আনতে পাঠাগারের মাধ্যমে বই পড়াকে উৎসাহিত করছে। এছাড়াও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য খাবারের আয়োজন করা হয়ে থাকে। তারা বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু প্রজেক্ট চালু করেছে এবং এই প্রজেক্টের মধ্যমে তারা সব সময় মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

নিচে তাদের কার্যক্রমগুলো তুলে ধরা হলো:

২ টাকায় আমেজ: ২ টাকায় আমেজের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সময়ে ২ টাকায় শিক্ষা উপকরণ, ২ টাকায় খাবার, ২ টাকায় জামা-কাপড় বিতরণ করা হয়। ২ টাকা নেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা এই খাবার বা শিক্ষা সামগ্রী নিচ্ছে তারা যেন মনে না করে তারা দান নিচ্ছে তাই তাদের এই ২ টাকা নেওয়া। সংগঠনটি বছরে তিনবার এই দুই টাকায় বিভিন্ন খাবার ও জামা কাপড় দিয়ে থাকে (২ ঈদ এবং শীতের সময়)।

ভালোবাসার ডালা: যেসব মহিলাদের ছেলেমেয়ে নাই তাদের জন্য উপহার হিসাবে এই ভালোবাসার ডালা দিয়ে থাকে সংগঠনটি।

ভালোবাসার ছোঁয়া: যেসব মহিলাদের পরিবারে স্বামী নাই তারা সেই সব মহিলাদের বাড়িতে সবরকম বাজার করে নিয়ে যায় এবং গ্রামের কিছু গরীব মানুষদের দাওয়াত দিয়ে সেই বাড়িতে সকলের জন্য খাবারের আয়োজন করা হয়।

ফ্রি বাজার: ফ্রি বাজারের মাধ্যমে ২০২১ ও ২০২২ সালের এই করোনাকালে গরিব অসহায় মানুষের মাঝে মাসে দুই-তিন বার ত্রাণ বিতরণ করেছে। যাতে ছিল চাল, ময়দা, সাবান, মাস্ক, আলু, পেঁয়াজ-রসুনসহ ১২টা আইটেম।

ভ্রাম্যমান পাঠাগার: শিক্ষার্থী সহযোগিতা সংগঠন ভ্রাম্যমান পাঠাগারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই পড়তে আগ্রহী করে তুলতে কাজ করে। বাচ্চারা এখন আর টিফিনের সময় গল্প নিয়ে পরে থাকে না। তারা এখন বই পড়ে। শিক্ষার্থী যেন বই বাসায় নিয়ে পড়তে পারে সেই ব্যবস্থাও করে দিয়েছে সংগঠনটি। 'পৃথিবী হোক বইয়ের' এই স্লোগানকে সামনে রেখে সংগঠনটি পাঠাগার নিয়ে কাজ করছে। এই ভ্রাম্যমান পাঠাগারটি প্রতিটি স্কুলে সাত দিন করে অবস্থান করে। যেখানে সবাই ফ্রিতে বই পড়তে পারে এবং এই পাঠাগারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় কুইজ প্রতিযোগিতাও আয়োজন করা হয়।

ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়: প্রায় এক হাজার জন মানুষের মাঝে ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। তারা চায় বাংলাদেশের সব মানুষ তার নিজের ব্লাড গ্রুপ জানবে এবং প্রয়োজনে রক্তদান করে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসবে।

স্বাবলম্বী: বেকারত্ব দূর করতে এখন পর্যন্ত তারা তিন জন মানুষকে তিনটা দোকান করে দিয়েছে।

রমজানের ফুড ইভেন্ট: সংগঠনটি চার বছর ধরে রমজান মাস জুড়ে পাবনার বেড়া অঞ্চলে বিনামূল্যে তিনটি এতিমখানাসহ ৫ হাজার মানুষের জন্য ইফতার ও সেহেরির আয়োজন করে যাচ্ছে।

স্বাক্ষর: নদী পাড়ের মানুষরা যেনো অন্তত তাদের নাম লিখতে পারে সে জন্য তারা তাদের বাংলা বর্ণমালা শিখাচ্ছে। তারা চায় এক সময় বাংলাদেশের সব মানুষ তাদের নাম লিখতে পারবে।

সংগঠন সূত্রে জানা যায়, সংগঠনটি প্রথমে টিফিনের টাকায় যাত্রা শুরু করে। আর বর্তমানে ফেসবুকের কল্যাণে সংগঠনের কাজ এখন বিস্তৃত হয়েছে। তারা সব সময় কে তাদের সংগঠনে টাকা দান করছে আর ঐ টাকা কোথায় ব্যয় করা হচ্ছে তা গ্রুপে প্রকাশ করে। নিজেদের জমানো টিফিনের টাকা ও বিত্তবানদের কাছ থেকে পাওয়া সহায়তা সংগঠনের মূল পুঁজি। অসহায়ের জন্য কাজ করে তার পারিশ্রমিক হিসেবে সেই মানুষগুলোর তৃপ্তি ভরা হাসি প্রতিষ্ঠাতা মেহেরাব হোসেন জিম-এর সবচেয়ে বড় শক্তি এবং প্রাপ্তি। তিনি বলেন পড়াশুনায় তো আমরা ২৪ ঘন্টা সময় ব্যয় করি না। অপচয় হয় অনেক মূল্যবান সময়। এই সময়টা অপচয় না করে সমাজ বিনির্মাণে দিলে তাতে ব্যক্তি-পরিবার তথা পুরো দেশের জন্যই মঙ্গলের হয়। ইচ্ছা শক্তিই জগতকে পরিচালনা করে থাকে। আমাদের সবার মনে ইচ্ছা জাগা উচিত আমরা আর কাউকে না খেয়ে থাকতে দিবো না। মেহেরাব জিম আরও বলেন, টিফিনের টাকা জমা করে ভালো কিছু করার উদ্দেশ্যে প্রথমে পাঁচজন বন্ধু মিলে আমাদের পথচলা শুরু হয়েছিলো। প্রথমে ভাবি নাই যে আমরা এতো কিছু করতে পারবো। এই পৃথিবীতে আমরা সবাই এসেছি খুবই কম সময়ের জন্য তাই মানবিক কাজই আমাদের এই ভ্রমণকে সত্যিকারের আনন্দময় করতে পারে। যত বেশি ভালো কাজ, যত বেশি মানবিক কাজ তত বেশি মানসিক শান্তি।

লেখক: শিক্ষা সুপারভাইজার, সিদীপের দেবোত্তর ব্রাঞ্চ, পাবনা

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও প্রবীণ সম্মাননা

শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস

মো. জাহিদুল ইসলাম

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)-এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া স্যারের মতে– উন্নয়ন হলো একটি সামগ্রিক বিষয় যা অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্যগত ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল বিষয়ের উন্নয়নকে বুঝায়। তাই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে হলে সকল সেক্টরেই উন্নয়ন করতে হবে। সেই লক্ষ্যে সিদীপ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক এবং উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক), যা ২০০৫ সাল থেকে শুরু হয়েছে। শিসক-এর মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করা। 'কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর- কেউ রবে না নিরক্ষর' স্লোগানকে ধারণ করে সফলতার সাথে শিসক এগিয়ে চলছে।

শিসক-এর মাধ্যমে প্রাথমিক স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধে ১৮০০ গ্রামে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য প্রায় ২৭০০ 'উঠান স্কুল' প্রতিষ্ঠা করে অর্ধলক্ষের বেশি শিশুকে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। উঠান স্কুলে শিক্ষার্থীদের স্কুলের পড়া তৈরি করার পাশাপাশি শিশুদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা চর্চা, শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়তার লক্ষ্যে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা করানো হয়। শিশুরা হাত-পায়ের নখ কেটেছে কিনা, সময়মতো হাত ধোঁয় কিনা, সর্বদা পরিষ্কার থাকে কিনা ইত্যাদি খোঁজ নেয়া হয় কড়াকড়িভাবে। পাশাপাশি 'প্রকৃতি-পাঠ' কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের চারপাশের গাছপালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। সকল চর্চাই মূলত একজন শিশুকে দেশের শিক্ষিত ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস। যাতে করে শিশুরা পরিবার ও সমাজের বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হতে পারে এবং তারা আগামিতে দেশের উন্নয়ন যাত্রাকে আরো গতিশীল করতে পারে।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)-এর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দানের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক মেধা ও মনন বিকাশের জন্য শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে একদিন নাচ-গান-অভিনয়-কবিতা আবৃত্তিসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চা করানো হয়। সিদীপ চায় প্রতিটি শিশু তার পূর্ণাঙ্গ মানবিক অধিকার নিয়ে একজন সুনাগরিক হিসেবে বিকশিত হোক। এ লক্ষ্যে ২০১২ সাল থেকে নভেম্বর মাসকে শিশুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তথা স্বাস্থ্যচর্চার মাস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। সিদীপ উপলব্ধি করে যে, কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যই নয়, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যচর্চাও জরুরি। সাংস্কৃতিক চর্চা একজন শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটায়, আলোর পথ দেখায় এবং খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে রাখে। এই উপলব্ধি থেকেই ২০১৩ সাল থেকে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপনের ঘোষণা করা হয় এবং তা চলে আসছে।

২০১৯ সালের পর মহামারী করোনার কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর এ বছর 'সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও প্রবীণ সম্মাননা' উদযাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এ সকল অনুষ্ঠানগুলো দেখার জন্য সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের প্রায় সকল কর্মকর্তা বিভিন্ন ব্রাঞ্চে যান। এবারো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো আগের বছরগুলোর তুলনায় ছিল আরও বেশি স্বতঃস্ফূর্ত এবং আনন্দঘন। কোনরকম প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়া সকল শিক্ষার্থীদের পরিবেশনাগুলো ছিল খুবই সুন্দর। ক্ষুদে শিক্ষার্থী কর্তৃক শত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ছড়া-কবিতা, নাচ, গান, অভিনয়, কৌতুক, যেমন খুশি তেমন সাজো প্রভৃতির সাবলীল উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেছে।

শিশুদের মাঝে বড়দের প্রতি সম্মান করার অভ্যাস গড়ে তুলতে ২০১৫ সাল থেকে সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সাথে যুক্ত করা হয় 'প্রবীণ সম্মাননা'। প্রবীণ সম্মাননার অংশ হিসেবে এলাকার একজন প্রবীণ নারী ও প্রবীণ পুরুষকে শিশুরা গলায় ফুলের মালা পরিয়ে মঞ্চে বরণ করে নেয় এবং উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রবীণ সম্মাননা প্রতিটি অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণে রূপ নেয়। মুগ্ধ হয়ে অনেকে মন্তব্য করেন যে, বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা অন্যতম মানবিক গুণ। কিন্তু বর্তমান সমাজে বড়দের সম্মান করা সবাই প্রায় ভুলে। যার ফলে মা-বাবা বৃদ্ধ হয়ে গেলে অনেক ছেলে-মেয়ে তাদের বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। সিদীপের এই উদ্যোগের ফলে শিশুরা বড়দের সম্মান করতে শিখবে, যা খুবই প্রশংসনীয়। প্রায় ২৭০০ শিক্ষাকেন্দ্রের কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সমাজের প্রবীণদের সম্মাননা প্রদর্শনের ফলে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হবে। শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে।

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও প্রবীণ সম্মাননা অনুষ্ঠান অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছর একটি স্লোগান নির্ধারণ করে ছবিসহ পোস্টার করে প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া হয়। এ বছরের স্লোগান ছিল– 'প্রবীণের মর্যাদা সবার উপরে, প্রবীণেরা সুখী হোক সবার ঘরে'। বিগত বছরগুলোর স্লোগান ছিল- 'আমরা বড়দের সব সময় সম্মান করব'; 'নবীনের সমৃদ্ধি প্রবীণের দানে, রাখবো তাদের সুখে ও সম্মানে" প্রভৃতি।

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও প্রবীণ সম্মাননা অনুষ্ঠান সমাজে সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। ঘরকোণায় থাকা লাজুক ছেলেটি এখন জনসম্মুখে সাহসের সাথে ছড়া বলতে পারে, লাজুক মেয়েটি এখন সকলের সামনে নাচতে পারে, অভিনয় করতে পারে। আগামী বছর তাদের আরও ভালো করতে হবে, এজন্য তারা এখন লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত সাংস্কৃতিক চর্চা করছে। গ্রামের শত মানুষের সামনে শিশুদের থেকে ফুলের মালার মাধ্যমে সম্মাননা পাওয়া প্রবীণ নারী-পুরুষ এক সময় নিজেকে সমাজের অবহেলিত ও বোঝা মনে করলেও এখন তিনি নিজেকে সমাজের সম্মানিত একজন মনে করেন। শিশুরা এখন বয়স্ক নারী-পুরুষ দেখলে সালাম দিয়ে তাদের সম্মান করে।

শিশুদের মানসিকতার বিকাশে লেখাপড়ার পাশাপাশি সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপক। তাই বর্তমান প্রজন্মের মানসিকতা বিকাশের লক্ষ্যে সিদীপের এই রকম সাংস্কৃতিক কর্মসূচি সহায়ক হবে। এতে করে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক চর্চায় উদ্বুদ্ধ হবে। শিশুদের নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এরকম উদ্যোগ আরো বেশি বেশি নেওয়া উচিত বলে অভিমত দেন অনেক অভিভাবক। সিদীপের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ফলে গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার শিশুদের লুক্কায়িত প্রতিভা প্রস্ফুটিত হবে সুন্দরভাবে। এতে করে শিশুদের সৃষ্টিশীল মানসিকতা গড়ে দিতে সক্ষম হলে নিঃসন্দেহে দেশ ও সমাজের জন্য তা সুফল বয়ে আনবে।

লেখক: প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা

আমার অভিজ্ঞতায়

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও প্রবীণ সম্মাননা-২০২৫

প্রতাপ চন্দ্র রায়

সিদীপ পরিচালিত শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচী এমন একটি উদ্যোগ যা শিশুদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ২০০৫ সালের ১লা এপ্রিল শুরু হওয়া শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনা এবং শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া রোধে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রতিদিন বাড়ি থেকে পড়া শিখে এবং কিছু হোমওয়ার্ক করে নিয়ে আসতে হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অধিকাংশ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী পড়ালেখা না জানার কারণে বাবা-মায়েরা তাদের বাচ্চাদের বাড়ির পড়া বা হোমওয়ার্কের কাজে সহায়তা করতে পারে না যার জন্য শিশুরা অনেক সময় স্কুল-বিমুখ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষিকারা শিশুদের স্কুলের হোমওয়ার্ক প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে একজন মায়ের ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি শুধু শিশুদের পড়াশোনা করায় না, পাশাপাশি শিশুদের সুস্থ থাকার লক্ষ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে খেলাধুলার আয়োজন ও প্রকৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য প্রকৃতি পাঠের আয়োজন করে থাকে। যেখানে শিশুদের বিভিন্ন ধরনের গাছ পালা ও এর উপকারিতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। এছাড়াও শিশুদের বুদ্ধিগত দক্ষতা ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিবছর সাংস্কৃতিক সপ্তাহের আয়োজন করা হয় যেখানে সারাদেশের প্রায় ২৭০০ শিক্ষাকেন্দ্রে প্রায় ৫৬,০০০ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে সপ্তাহব্যাপী নানান ধরনের সাংস্কৃতিক তথা নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানগুলোতে প্রবীণদের প্রতি সম্মানার্থে প্রবীণ সম্মাননা প্রদান করা হয় যেখানে স্থানীয় সবচেয়ে প্রবীণ নারী ও পুরুষকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তবে মহামারী Covid-19 এর জন্য ২০২০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক সপ্তাহ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়নি। দীর্ঘ ৫ বছর পর শিশুদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ২০২৫ সালে পুনরায় সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও প্রবীণ সম্মাননা অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে। এ বছর সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও প্রবীন সম্মাননা অনুষ্ঠানের স্লোগান ছিল:

> "প্রবীণের মর্যাদা সবার উপরে
> প্রবীণেরা সুখী হোক সবার ঘরে"

দীর্ঘদিন পর সাংস্কৃতিক সপ্তাহ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবার কারণে প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দসহ সিদীপের

সকল সহকর্মী উৎফুল্ল মনোভাবে ছিল। প্রতিবারের ন্যায় এবছরও প্রধান কার্যালয়ের অধিকাংশ কর্মকর্তাগণ শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি চলমান রয়েছে এমন সকল ব্রাঞ্চেই আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা হিসেবে সলিমগঞ্জ, শ্রীকাইল ও রতনপুর ব্রাঞ্চের শিসক কর্মসূচির শিক্ষাকেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ফিল্ড অফিসার, সেকমো, শিক্ষা সুপারভাইজার, শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকবৃন্দ, এলাকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ এবং শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দুপুরের পরপরই প্রতিটি অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে এবং প্রতিটি অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রবীণদের সম্মান করার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে অত্র এলাকার সবচেয়ে প্রবীণ ১ জন পুরুষ ও ১ জন নারীকে ফুলের মালা পরিয়ে প্রবীণ সংবর্ধনা প্রদান করেন ২ জন শিক্ষার্থী। পরবর্তীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্ব শুরু হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, একক অভিনয়, গান, নৃত্য ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। কবিতা আবৃত্তির মধ্যে ছোট শিশুদের মুখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “আমাদের ছোট নদী” কবিতাটি উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেছে এবং নৃত্য পরিবেশনার মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচের সাথে তাল মিলিয়ে ছোট্ট শিশুর আব্বাস উদ্দিনের “এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া” গানের সাথে পরিবেশিত নৃত্য সকলকে মুগ্ধ করেছে। প্রতিটি পর্বে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করেছে এবং পরিশেষে স্থানীয় অভিভাবকদের উদ্যোগে শিশুদের পুরষ্কার বিতরণী কার্যক্রমের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রতিটি ব্রাঞ্চের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই খুবই সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সাংস্কুতিক অনুষ্ঠান দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের মানসিক উৎকর্ষ সাধণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ছোট ছোট শিশুরা শত শত দর্শকের সামনে নৃত্য, গান, কবিতা, একক অভিনয় ইত্যাদি পরিবেশন করছে, এর ফলে তাদের মধ্যে থাকা জড়তা যেমন ভাঙ্গছে তেমনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবার প্রত্যয়ও শিশুদের মধ্যে গড়ে উঠছে। দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ঝরে পড়া রোধে ও বুদ্ধিদীপ্ত ভবিষ্যতের প্রত্যয়ে সিদীপ তার গর্বিত অংশীদার।

লেখক: জুনিয়র অফিসার, সিদীপ

নারী দিবস

“অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন-নারী ও কন্যার উন্নয়ন” এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে ৯ মার্চ ২০২৫ সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে উদযাপিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিনের শুরুতেই সিদীপের সকল নারী কর্মীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত হয় ‘মুক্তকথন’ শিরোনামে মতবিনিময় সভা। যেখানে প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের সকল নারী কর্মী সরাসরি ও অনলাইনে যুক্ত হয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করেন। এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের সকলের উপস্থিতিতে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া অডিটোরিয়ামে সচেতনতামূলক ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

মুক্তপাঠাগার আয়োজিত

ভাষার মাসে বইয়ের মেলা

২৭ ফেব্রুয়ারি ভাষার মাস মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার ও সালাহ্উদ্দিন কিন্ডারগার্টেন এন্ড হাই স্কুলের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জের মদনগঞ্জে উক্ত স্কুলে "ভাষার মাসে বইয়ের মেলা" আয়োজিত হয়। দিনব্যাপী এ আয়োজনে বইমেলার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছিল উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বই পর্যালোচনা প্রতিযোগিতা এবং জাতি গঠনে বই ও পাঠাগারের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনাসভা ও পুরস্কার বিতরণী। বই পর্যালোচনা প্রতিযোগিতায় ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে যেখানে ২৫ জন শিক্ষার্থী আশরাফ আহমেদের 'একাত্তরের হজমিওয়ালা' ও বাকি ২৫ জন সিদীপ প্রকাশিত 'আমাদের শিক্ষা নানা চোখে' বই পড়ে তার পর্যালোচনা লিখে। সেখান থেকে সেরা ছয়জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া উপস্থিত বক্তৃতায় বিদ্যালয়ের সেরা তিনজন বক্তাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। 'জাতি গঠনে বই ও পাঠাগারের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনায় প্রধান আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান।

উক্ত মেলায় সিদীপ প্রকাশনীর বিভিন্ন বই ছাড়াও অন্যান্য প্রকাশনী সংস্থার বইও উপস্থাপন করা হয়। স্কুলের শিক্ষার্থীরা আগ্রহ সহকারে বইগুলো দেখেন এবং বেশ কিছু শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক বই ক্রয় করেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব সালাহ্উদ্দিনের সভাপতিত্বে বইমেলার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা জনাব মো. কুতুব উদ্দিন। এছাড়া ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক শারমীন

ফারজানা এবং অন্যান্য শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অতিথিগণ সিদীপের এমন উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ম্যানেজিং কমিটি ভবিষ্যতে তাদের স্কুল প্রাঙ্গণে এধরনের কার্যক্রমে সবসময় পাশে থাকার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন। এছাড়া সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজার শারমিন আক্তার এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হুমায়ুন কবির এবং প্রধান কার্যালয় থেকে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম ও গাজী জাহিদ আহসান উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষাসুপারভাইজারদের অংশগ্রহণে

সমাজকর্ম বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা

সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষা সুপারভাইজারদের মাঝে প্রতি বছর একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২০২৪ সালে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল "আমার এলাকায় স্বেচ্ছাসেবামূলক উন্নয়নকর্মের চিত্র এবং একজন সৎ ও নিবেদিত-প্রাণ সমাজকর্মী বা সংগঠনের কথা"। উক্ত রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষা সুপারভাইজারদের রচনার মধ্য থেকে ২৪টি রচনাকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সেরা ও ভালো হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। নিচে বিজয়ীদের তালিকা দেয়া হলো:

ক্র: নং	নাম	শাখা	অর্জিত স্থান
০১	কাকলী খাতুন	দেবোত্তর শাখা	১ম
০২	ফাহমিদা জেসমিন	বাঘা	২য়
০৩	কুলসুম বিবি	মাথা ভাঙ্গা	২য়
০৪	মোছা. সুমি খাতুন	বনপাড়া	৩য়
০৫	মোসা. নাহিদ আক্তার	নিমসার	সেরা
০৬	আফরিন সুলতানা	গাউছিয়া	সেরা
০৭	মোছা. ঝর্ণা	তাহেরপুর	সেরা
০৮	নাহিদা হক	ভোলাচং	সেরা
০৯	মোছা. মাজেদা খানম	মাধাইয়া	সেরা
১০	মোসা. কিসমোতারা খাতুন	শিবগঞ্জ	সেরা
১১	নাজমা আক্তার	চারগাছ, ধরখার	সেরা
১২	মোছা. সুমাইয়া শিমু	বড়কুমিরা	ভালো
১৩	সামান্তা দুলাল	কুটি	ভালো
১৪	মোসা. তহুরা আক্তার	কাটাখালি	ভালো
১৫	রুনা আক্তার	বিটঘর	ভালো
১৬	মোরশিদা আক্তার	বারেরা	ভালো
১৭	মোছা. তাহসিনা খাতুন	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ভালো
১৮	মুক্তি আক্তার	মদনপুর	ভালো
১৯	মোছা. মাফরোজা খাতুন	বাগাতিপাড়া	ভালো
২০	শিউলী আক্তার	গাজীপুর সদর	ভালো
২১	মোছা. পপি খাতুন	বালুচর	ভালো
২২	তাহামিনা আক্তার	সোনারগাঁও	ভালো
২৩	মোছা. রুখসানা আক্তার	সাঁথিয়া	ভালো
২৪	মাজেদা আক্তার (শিক্ষিকা)	খিলাবাজার	বিশেষ

একজন নারী উদ্যোক্তা

আফুজার সাফল্য

মো. আব্দুল মান্নান সরদার

কৃষির উন্নয়নে অভাবনীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে এগিয়ে চলেছেন রাজশাহীর বাগমারা থানার ভবানীগঞ্জ উপজেলার অর্জুনপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোসা. আফুজা বেগম। স্বামী মো. সাইদুর প্রাং। সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে সুখ্যাতি।

আমাদের গ্রামীণ সমাজে দেখা যায় নারীরা সংসার রান্নাবান্না, ছেলে মেয়ে, ঘর গোছানোর পরে বাকি সময় কৃষি কাজে পুরুষকে সহযোগিতা করে। তবে কেউ করে কেউ করেনা। কিন্তু আফুজা বেগম নিজেই একজন কৃষি উদ্যোক্তা। সংসারের কাজের পাশাপাশি তিনি কৃষিতেই বেশি সময় দেন এবং মাঠফসল দেখাশুনা করেন। আফুজা বেগমের পরামর্শ মতেই আবাদ ফসল করা হয়।

আফুজা বেগমের কাছে তার সফলতার কথা জানতে চাইলে তিনি তার জীবনের শুরুর দিকে কিছু কথা বলেন।

তিনি জানান গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম তার। তার পরিবারে সবাই শিক্ষিত এবং চাকুরীতে নিয়োজিত। ভাগ্য কপালে বিয়ে হয় প্রান্তিক আকারের কৃষক পরিবারে। বিয়ের পর আফুজা বেগমের স্বামী বাবার সংসার থেকে আলাদা হয়ে যায়। একটু সুখের আশায় ভালোভাবে দিন কাটানোর জন্য বিদেশ যাবার কথা চিন্তা করেন। আফুজা বেগম প্রথমে রাজি না হলেও স্বামীর চাপে আর কিছু বলেন না । কিছু নিজের গহনা ও একটা গরু বিক্রয় আর কিছু টাকা ধার করে তার স্বামী বিদেশে যান। ভাগ্য খারাপ হলে যা হয়। ভাল কাজ না পাওয়ায় চলে আসতে হয় তার স্বামীকে। এরপর তার পরিবারে অভাব আর হতাশা বাসা বাধে। এক সন্তানকে নিয়ে খুব কষ্টে দিন যাপন করতে থাকেন। আফুজা বেগমের স্বামী দিনমজুরের কাজ শুরু করেন। সংসারের খরচ চালানোর জন্য আফুজা বেগম হাঁস মুরগি পালন শুরু করেন। তার স্বামীর পৈতৃকসূত্রে পাওয়া ১০ কাঠা জমিতে চাষাবাদ শুরু করেন। আফুজা বেগমের স্বামী মানুষে কাজে যাওয়ায় নিজের জমিতে বেশি সময় দিতে পারেন

না। জমি বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায় আফুজা নিজেই দেখাশুনা শুরু করেন। তাদের এলাকায় রসুন, পেঁয়াজ ও সবজি জাতীয় ফসল ভালো চাষ হয়। ১০ কাটা জমিতে তারা পেঁয়াজ চাষ করে। ঐ বছর পেঁয়াজ থেকে সমস্ত খরচ বাদে প্রায় ৩০-৩৫ হাজার টাকা লাভ করতে পারে। আফুজা বেগম চিন্তা করেন এই টাকা দিয়ে কিছু জমি লিজ নিবেন এবং তার ইচ্ছা সবজি চাষ করে নিজেই তদারকি করবেন। তিনি ৩৩ শতাংশ জমি লিজ নেন এবং টমেটো চাষ করেন । তিনি বলেন নিবিড় পরিচর্যা, কঠোর পরিশ্রম ও ভাগ্যগুণের কারণে তার চাষাবাদ সফল হয়। টমেটোর ফলন ভালো হয়। ৫০-৬০ হাজার টাকার টমেটো বিক্রি করে খরচ বাদে ৩০-৪০ হাজার টাকা লাভ হয়। আফুজা বেগম চিন্তা করেন কৃষির পাশাপাশি গরু ছাগল পালন করার। আফুজা বেগমের স্বামী প্রথমে রাজি হয়না কারন গরু ক্রয় করার মত টাকা ছিলো না। আফুজা বেগম বলেন সমিতি হতে টাকা উঠানোর জন্য। সে সাহস দিয়েছে কৃষি আবাদ ফসল করে ঋণের টাকা পরিশোধে করতে সক্ষম হবে। তখন আফুজা বেগম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিদীপের মাঠকর্মীর সাথে যোগাযোগ করেন। ঋণ প্রস্তাব করা হলে সিদীপের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যাচাই করে ৭০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করেন। আফুজা বেগম টাকা দিয়ে একটি ষাঁড় গরু ক্রয় করেন। আফুজা বেগম তার স্বামীকে মানুষের কাজে যেতে নিধেষ করেন। কৃষি কাজ করে তারা প্রতিবছর পর্যায়ক্রমে এভাবে কিছু কিছু জমি লিজ নেন এবং বিভিন্ন ধরনের সবজি যেমন লাউ, টমেটো, শশা ইত্যাদি চাষ করেন। পাশাপাশি নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে সদস্য হিসাবেও সিদীপে ভালো সুনাম অর্জন করেন। ধীরে ধীরে তার কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যার কারণে তার আরও কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। তখন তাকে এসএমএপি (কৃষি ঋণ) এর কথা বলা হয়। প্রথমবার তিনি ৩০,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। এই টাকা গ্রহণের সময় তিনি কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পান। আফুজা বেগম বলেন এ সময় তিনি কৃষি বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারেন যার মধ্যে সবজি চাষে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারে ফলন ভালো পাওয়া যায় উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন বর্তমানে তার ২-৩টি গরু সব সময় থাকে। প্রশিক্ষণ শেষে গরুর গোবর তিনি জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করেন। এর আগে তিনি কখনোই আলাদা করে জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করেননি।

মাটির জীবনীশক্তি ধরে রাখতে জমিতে তার এ ধরনের জৈব সার আলাদা ভাবে প্রয়োগ করতে দেখে আশেপাশের কৃষকরা প্রথমে একটু অবাক হয়। পরবর্তীতে ফসলের অবস্থা দেখে তারা এই সারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।

এতে রাসায়নিক সারের পরিমাণ অনেক কম লাগে। সবজি ফসলের আকার আকৃতি, রং ও ভালো হয় দামও ভালো পাওয়া যায়। আফুজা বলেন বর্তমানে ৫ বিঘার মত আবাদ করেন। তিনি বহুমুখী ধরনের সবজি আবাদ করে থাকেন। তার স্বামীর সাথে ছেলেও পড়াশোনার পাশাপাশি কৃষি কাজে সহযোগিতা করেন। তার স্বামীকে এখন আর অন্যের কাজ করতে হয়না । তাদের একটি সেচ পাম্পও আছে যা দিয়ে নিজেদের জমিতে সেচ দিয়ে থাকেন এবং মাঝে মাঝে ১৪০-১৫০ টাকা ঘন্টা চুক্তিতে অন্যের জমিতেও পানি সেচ দেন যা থেকে বাড়তি আয় আসে। তিনি বলেন তার পরিবার এখন সচ্ছল। সততা, ধৈর্য আর কঠোর পরিশ্রমই তার ভাগ্য বদলে দিয়েছে।

আফুজা বেগম আরো বলেন আমি সিদীপ এবং সিদীপের সকল কর্মকর্তাদের সাধুবাদ জানাই সঠিক সময়ে অর্থ ও কারিগরি সেবা প্রদান করার জন্য ।

আফুজা সাইদুরের এই সফলতা এলাকার অন্য নারীদের কৃষিতে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করবে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি পাবে।

লেখক: ফিল্ড অফিসার (এগ্রি), মাইজদী ব্রাঞ্চ, সিদীপ

সিমু খাতুনের সফলতার গল্প

মো. জাহিদ হাসান

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার, কেওয়া গ্রামের দরিদ্র পরিবারের গৃহবধু মোছা. সিমু খাতুন। স্বামী মো. তাইজুদ্দিন। সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত তাদের। যদিও ১ বিঘা জমি আছে, কিন্তু টাকার অভাবে জমিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হত না। তাই স্বামী প্রায় সারা বছর অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করে এবং অল্প কিছুদিন নিজের জমিতে কাজ করে। তবে কাজ না থাকা এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রতিদিন কাজ করতে পারে না। এভাবেই চলে সিমু খাতুনের সংসার। সিমু খাতুনের পরিবারে দুই সন্তান ও শ্বশুরসহ সদস্য সংখ্যা ৫ জন। দারিদ্র্যের কারণে দিন রাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার পরও সংসারের অভাব দূর হয় না। পাড়া প্রতিবেশীর নিকট

থেকে সিমু খাতুন জানতে পারে যে, সিদীপ নামে একটি সংস্থা আছে এবং সংস্থাটি দরিদ্র প্ররিবারের লোকদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে যার কিস্তি প্রতি মাসে বা সপ্তাহে পরিশোধ করতে হয়। এছাড়া আরও এক ধরনের ঋণ দেয় যার কিস্তি ৬ মাস বা ১ বছর এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করতে হয়। এককালীন পরিশোধের এ বিষয়টি তার খুব ভাল লাগে এবং এ ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে তার আগ্রহ জাগে। যেহেতু মাসিক বা সাপ্তাহিক কোন কিস্তি নেই, তাই ঋণ নিয়ে কোন কাজ করে এককালীন ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। এ বিষয়টি সিমু খাতুন তার স্বামীর সাথে আলোচনা করে এবং ঋণের টাকা দিয়ে তাদের সবজি খেতের জমিতে সবজি চাষ এবং আরও জমি বৃদ্ধি করে সেই জমিতে বিভিন্ন সবজি চাষ করে লাভের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব এবং লাভবান হওয়া সম্ভব বলে স্বামীকে জানান। স্ত্রীর চিন্তাভাবনা বাস্তব সম্মত বলে স্বামী তাইজুদ্দিন স্ত্রীর কথায় সম্মতি দেন এবং সিদীপ থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

তারপর সিমু খাতুন সিদীপের সদস্যদের মাধ্যমে সিদীপের সদস্যপদ লাভ করে এবং দুই সপ্তাহ পর সবজি চাষ প্রকল্পে ২০,০০০ টাকা ঋণ প্রস্তাব করে। প্রস্তাব অনুযায়ী তার ঋণ মঞ্জুর হয় এবং ঋণের টাকা দিয়ে সে তার জমিতে শিম, লাউ, টমেটো এবং ধান চাষ করে। ৬ মাসে সিমু খাতুন তার সবজি খেত থেকে সব সবজি মিলিয়ে প্রায় ৮০,০০০ টাকার সবজি

বিক্রয় করে এবং আন্যান্য সব খরচ বাদ দিয়ে তার লাভ হয় ৩০,০০০ টাকা। এই লাভের টাকা দিয়ে তারা আরও ১ বিঘা জমি বন্ধক নেয় এবং সিমু খাতুনের স্বামী শ্রম বিক্রি বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে সে আরও ৪০,০০০ টাকা ঋণ নেয়। ঋণের এ টাকা ও পূর্বের লাভের টাকা মিলিয়ে ৫০,০০০ টাকা দিয়ে আরও ১ বিঘা জমি বন্ধক নেয়। সিমু খাতুন এসএমএপি ঋণ গ্রহণের পূর্বে টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশনের সময় মাওনা ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরিচয় হয় এবং তাকে ১ বিঘা জমিতে উন্নত হাই ধান চাষ এবং আর ১ বিঘাতে বিভিন্ন ধরনের সবজি বীজ চাষে সার্বিক সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন। বর্তমানে সিমু খাতুন তার সবজি খেত থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১৫,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করেন যা থেকে খরচ বাদ দিয়ে তার প্রায় ৫০০০ টাকা লাভ হয়। ধান চাষে এবং সবজি ফসলের কোন সমস্যা বা রোগবালাই হচ্ছে কিনা তা সিদীপ ও মাওনা ইউনিয়ন পরিষদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। সিমু খাতুন বলেন এই ফসল উৎপাদন করতে তার জমি, সার, জমি চাষ, সেচ, নিড়ানী ও কর্তন বাবদ প্রায় ১৫,০০০-১৮,০০০ টাকা খরচ হবে। বর্তমানে ফসল যে অবস্থায় আছে তাতে এ ফসল বিক্রয় করে প্রায় ৫০,০০০-৬০,০০০ টাকা পাওয়া যাবে। সিমু খাতুন ও তার স্বামী তাইজুদ্দিন জানান ধান ও সবজি চাষ করে এক মৌসুমে প্রায় ৪০,০০০-৪৫,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব। সিমু খাতুন আরও বলেন, আল্লাহর বিশেষ রহমত কঠোর পরিশ্রম করলে, জীবনের সলফতা আসবেই। তিনি আরো বলেন, দুঃসময়ে যখন তার পাশে কেউ ছিলনা, তখন তার পাশে সিদীপ ছিল। তাই সিদীপকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

লেখক: ফিল্ড অফিসার (এগ্রি), মাওনা ব্রাঞ্চ, সিদীপ

শিক্ষালোকের আয়োজনে আলোচনা ও কবিতা পাঠের মাধ্যমে

কবি হেলাল হাফিজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

কথা বলছেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক

দ্রোহের ও তারুণ্যের খ্যাতিমান কবি হেলাল হাফিজ মৃত্যুবরণ করেন ২০২৪ সালের ১৩ই ডিসেম্বর। শিক্ষালোকের গত সংখ্যাটি (অক্টোবর ২০২৪ - জানুয়ারি ২০২৫) তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে প্রকাশিত। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকায় সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে শিক্ষালোকের উক্ত সংখ্যাটি কেন্দ্র করে আলোচনা ও কবিতা পাঠের মাধ্যমে প্রয়াত কবিকে স্মরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাম্প্রতিক দেশকাল পত্রিকার সম্পাদক ইলিয়াস উদ্দিন পলাশ এবং সাংবাদিক ও লেখক আমীন আল রশীদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান।

উক্ত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, "কবি হেলাল হাফিজ আন্দোলন-সংগ্রামের প্রেরণা, তাঁর কবিতা আশাবাদের।"

অনুষ্ঠানের সভাপতি শাহজাহান ভুঁইয়া বাংলাদেশের সংগ্রামী তরুণ-যুবকদের উপর হেলাল হাফিজের কবিতার ব্যাপক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে হেলাল হাফিজের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তাঁকে নিয়ে লেখা অসীম সরকারের একটি কবিতা পড়েন মাহবুব উল আলম এবং হেলাল হাফিজের 'একটি পতাকা পেলে' কবিতাটি আবৃত্তি করেন মিঠুন দেব।

সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীসহ লেখক, শিল্পী ও উন্নয়নকর্মীগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অতিথিগণের মাঝে ছিলেন চিত্রশিল্পী শিশির মল্লিক, উন্নয়নকর্মী হাফিজুল ইসলাম, উন্নয়নকর্মী ও ছড়াকার মাহফুজ সালাম, কবি ও পাঠাগার আন্দোলন কর্মী রেজাউল করিম শেখসহ অন্যান্য।

ভাষার মাসে
বইয়ের মেলা

স্থান: সালাহ্উদ্দিন কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড হাই স্কুল
মদনগঞ্জ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আয়োজনে

সালাহ্উদ্দিন কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড হাই স্কুল | মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার

সহযোগিতায়: সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

Shikkhalok
(a CDIP education bulletin)
12th year 1st issue, February-March 2025